কুহু ও কেকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অধ্যাপক চারুবন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিরচিত
কবির জীবনী ও কাব্যাংশের
টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত

আর, এইচ্, শ্রীমানী এণ্ড সন্স্
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩য় সংস্করণ

অগ্রহায়ণ—১৩৪২

দুই টাকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক আর, এইচ্, শ্রীমানী এণ্ড সন্স্—২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং পুরাণ প্রেস—২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী দ্বারা মুদ্রিত।

কবি ও বন্ধু

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

করকমলেষু—

ভূমিকা

'কুহু ও কেকা' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ,—অনেকের মতে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম। এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হইবার পর ইহার সরস এবং ঐশ্বর্য্যশালী কাব্য-সমৃদ্ধি তৎকালীন রসিক পাঠক সমাজকে অবিলম্বে মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি তুঙ্গীভূত হইয়াছিল। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকখানিকে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া বিশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যখন অতি প্রবল ভাবে সক্রিয়, তখন সত্যেন্দ্রনাথের উদয় এবং প্রকাশ। শুধু তাহাই নহে, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রকাব্যের একজন বিমুগ্ধ অনুরাগী; এবং এই অনুরাগ লালিত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত পরিচয়ের দ্বারা। তথাপি সত্যেন্দ্রনাথ স্বীয় কবি-প্রতিভার স্বকীয়তা বলে রবীন্দ্রনাথের দুরতিক্রম আকর্ষণী-শক্তিতে একটি সুস্পষ্ট সীমান্তরেখার বাহিরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এবং সেই কারণে বাঙলা দেশের কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার কাব্যের একটি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট স্থান আছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষার উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন ছাত্রের পক্ষে সত্যেন্দ্র-কাব্যের সহিত অপরিচয় দুরপনেয় নিন্দার কথা। আশা করা যায়, কলিকাতা এবং অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বাঙলা ভাষা পাঠ্যরূপে প্রচলিত আছে, অচিরে এই পুস্তকখানিকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার অধ্যাপক সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় বহু যত্নপূর্ব্বক এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থভুক্ত কাব্যের টীকা-ভাষ্য এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবিষ্ট করিয়া ইহাকে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ ভাবে মূল্যবান করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত চারু বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সুতরাং এই জীবনীতে যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের এবং সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু ছাত্রদের পক্ষেই নহে, সাধারণ পাঠকের পক্ষেও পরিশিষ্টভাগ 'কুহু ও কেকা'র কাব্য-অনুক্রমণ সুগম এবং চিত্তাকর্ষক করিবে। এই শ্রমসাধ্য উপকার সাধনের জন্য

বর্ত্তমান সংস্করণের প্রকাশক শ্রীযুক্ত অজিত শ্রীমানী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারু বাবুর প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত হইল দুই কারণে পরিশিষ্ট সংযোজনায় কলেবর বৃদ্ধি হেতু, এবং নানা দিক দিয়া অধিকতর সৌষ্ঠববিধানে ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত।

বিচিত্রা-নিকেতন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

সূচী

দুই সুর	...	১
জ্যোৎস্না-মদিরা	...	৩
কুহু ?	...	৪
মদন-মহোৎসবে	...	৫
মধুমাসে	...	৬
গান	...	৬
অবগুণ্ঠিতা	...	৭
চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা	...	৮
শূন্যের পূর্ণতা	...	১৩
সহজিয়া	...	১৪
লীলার ছল	...	১৫
লব্ধ-দুর্লভ	...	১৬
প্রিয়-প্রদক্ষিণ	...	১৯
তুমি ও আমি	...	২১
গ্রীষ্ম-চিত্র	...	২২
অকারণ	...	২৩
পান্থীর গান	...	২৬
মুগ্ধা	...	৩৩

সাড়ে চুয়াত্তর	...	৩৪
নাগ পঞ্চমী	...	৩৫
গ্রীষ্মের সুর	...	৩৬
অন্তঃপুরিকা	...	৩৮
আনন্দ-দেবতার প্রতি	...	৩৯
দরদী	...	৪০
রিক্তা	...	৪১
কনক-ধূতুরা	...	৪২
চাতকের কথা	...	৪৩
ঝোড়ো হাওয়ায়	...	৪৪
বজ্র কামনা	...	৪৬
যক্ষের নিবেদন	...	৪৮
দুর্দ্দিনে	...	৫০
গান	...	৫২
বর্ষা	...	৫৩
রামধনু	...	৫৪
তখন ও এখন	...	৫৫
প্রাবৃটের গান	...	৫৬
নূতন মানুষ	...	৫৮
প্রথম হাসি	...	৫৯
ভাদ্রশ্রী	...	৬০
ওগো	...	৬১
কাশ ফুল	...	৬৩
জোনাকী	...	৬৪

ফুল-সাজি	...	৬৫
জবা	...	৬৯
সৎকারান্তে	...	৭০
ছিন্ন মুকুল	...	৭১
অভয়	...	৭২
ভুঁই চাঁপা	...	৭৩
ছায়াচ্ছন্না	...	৭৪
গঙ্গার প্রতি	...	৭৫
বারাণসী	...	৭৭
ধূলী	...	৮০
হিমালয়াষ্টক	...	৮১
কাঞ্চন শৃঙ্গ	...	৮৩
মাটি	...	৮৫
মেঘলোকে	...	৮৬
দার্জ্জিলিঙের চিঠি	...	৯১
চূড়ামণি	...	৯৫
সিংহল	...	৯৬
ওঙ্কার-ধাম	...	৯৭
শোণ নদের প্রতি	...	৯৯
সিদ্ধিদাতা	...	১০০
ক্ষুদ্রের প্রার্থনা	...	১০১
প্রভাতের নিবেদন	...	১০২
পদ্মার প্রতি	...	১০২
শূদ্র	...	১০৪

পিপাসী	...	১০৫
পথের স্মৃতি	...	১০৬
পাগ্‌লা ঝোরা	...	১০৭
দুর্ভিক্ষে	...	১০৯
সংশয়	...	১১০
সাগর-তর্পণ	...	১১১
লরেল্‌	...	১১৩
কবি-প্রশস্তি	...	১১৪
১৪ই জ্যৈষ্ঠ	...	১১৬
অর্ঘ্য	...	১১৮
চৌদ্দ প্রদীপ	...	১১৯
হাহাকার	...	১২০
দেশবন্ধু	...	১২১
নিশান্তে	...	১২১
বিশ্ববন্ধু	...	১২২
শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে	...	১২৩
ছেলের দল	...	১২৪
পুনর্নব	...	১২৫
শীতান্তে	...	১২৬
ফুলশির্ণি	...	১২৭
ভোজ ও পুত্তলিকা	...	১২৯
পরীক্ষা	...	১৩২
আকিঞ্চন	...	১৩৪
আমি	...	১৩৭

আবার	...	১৩৮
ভিক্ষা	...	১৩৯
নফর কুণ্ডু	...	১৪০
আমরা	...	১৪০
ঋষি টল্‌ষ্টয়	...	১৪৩
কালোর আলো	...	১৪৪
জ্যোতির্ম্মণ্ডল	...	১৪৬
পথের পক্ষে	...	১৪৬
মেথর	...	১৪৭
যথার্থ সার্থকতা	...	১৪৮
বন্দরে	...	১৪৮
কাঁটা ঝাঁপ	...	১৫০
গান	...	১৫১
নিবেদিতা	...	১৫২
সুদূরের যাত্রী	...	১৫৩
সফল অশ্রু	...	১৫৪
নষ্টোদ্ধার	...	১৫৫
প্রার্থনা	...	১৫৭
নমস্কার	...	১৫৭
দেবদর্শন	...	১৫৯

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থ

বেণু ও বীণা—"পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি"। প্রবাসী।

ফুলের ফসল—বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একখানি উৎকৃষ্ট "লিরিক্" ভারতী।

কুহু ও কেকা—প্রবাসী-পত্রের সংগৃহীত ভোট অনুসারে বঙ্গভাষার এক শত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্যতম।

তীর্থ-সলিল—"কবিত্বের ও বিদ্যাবত্তার পূর্ণ পরিচয়।" বঙ্গবাসী।

তীর্থরেণু—"তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে ইহা সৃষ্টিকার্য্য।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্মদুঃখী—অন্যায় পীড়িত দরিদ্র জীবনের করুণ কাহিনী। নরোয়ের একখানি সুবিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ।

চীনের ধূপ—চীনদেশের ঋষি ও মনীষিদিগের ভাব সম্পূট।

হসন্তিকা—হাসির গান ও মজার কবিতা।

মণি-মঞ্জুষা—বহুদেশের বহু কবির বিচিত্র রসের মধুর কবিতার সরল অনুবাদ।

অভ্র-আবীর—"ইজ্জতের জন্য নূরজাহান" "মহা সরস্বতী" প্রভৃতি শতাধিক কবিতা আছে।

রঙ্গমল্লী—প্রাচীন ও নবীন নাটকীয় আর্টের সমাবেশ।

তুলির লিখন—নূতন ধরণের কবিতার বহি। কবিতায় গল্প।

বিদায় আরতি—কবির বহু বিক্ষিপ্ত রচনা সংগ্রহ।

বেলাশেষের গান—বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ।

কাব্য-সঞ্চয়ন—শ্রেষ্ঠ কবিতার সমষ্টি।

হোমশিখা—"ইহাতে উচ্চ চিন্তার কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

কুহু ও কেকা

দুই সুর

কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি,
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি' মন চুরি !
কুজ্ঝটিকা-কুটিল নভে বুলায় তূলি রঙ্গিলা,
দোলায় তৃণ বল্লরীতে মঞ্জু ফুল-মঞ্জরী !

বনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে,
কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুরে সন্তরে !
শীতের গড়ে পাথর নড়ে—মুহুর্মুহু হয় ঢিলা,
মোচন হ'ল বন্দী যত মুকুল কুহু-মন্তরে !

সুধীর সুখী শিখী সে নাচে হেলায়ে গ্রীবা গৌরবে,
আওয়াজে তার কদম ফোটে,—কানন ভরে সৌরভে ;
কলাপ মেলি' করে সে কেলি রৌদ্রে স্নেহ সঞ্চারি',
ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে !

দগ্ধ দেশে মুগ্ধ নাচে নয়ন মেঘে অর্পিয়া,—
মেদুর নভে ধূমল ফণী বেড়ায় যবে দর্পিয়া!
তমাল 'পরে নৃত্য করে কুহক কেকা উচ্চারি',
মূর্চ্ছি' পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া!

বনের কুহু, বনের কেকা,—কুহক-ভরা যুগ্ম-রাগ,
দেয় গো বাঁটি নিখিল মাঝে আনন্দেরি যজ্ঞভাগ!—
অনাদি সুধা,—অনাদি সোম,—হয় না কেহ বঞ্চিত;
অনাদি সাম, অনাদি ঋক পূর্ণ করে বিশ্ব-যাগ।

মনের কুহু,—মনের কেকা,—অনাদি তারো মূর্চ্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।
গহন-গেহে নিভৃতে রহে নিখিল-হৃদি-সঞ্চিত,
মিলিয়া আছে উহারি মাঝে বরষা সাথে জ্যোৎসনা।

আপনি পড়ে ছন্দে ধরা আপনি তার উদ্বোধন,—
ক্রৌঞ্চী কাঁদে করুণ কুহু,—কবি সে—কেকা,—ক্ষুব্ধ মন।
উলসি' ওঠে গুপ্ততোয়া সুপ্ত নদী সুড়ঙ্গের,
কল্পলতা মুকুল মেলি' বিতরে চির গুপ্ত-ধন।

আদিম কুহু, আদিম কেকা,—ধরিবে কেবা ছন্দে সে,—
—জনম যার কামনা-লোকে মনের সুগোপন দেশে;—
ফুটায়ে ফুল, ছুটায়ে হাওয়া, লুটায়ে ফণা ভুজঙ্গের
মিলায়ে দুঁহু গাহিবে মুহু—গাহিবে মহানন্দে সে।

ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে,—গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে !
কামনা বুঝি কনক-ধূনী সুমেরু চূড়া লঙ্ঘিতে !
মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ-তটে অযুত শত ভঙ্গীতে ।

হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে !
ধেয়ানে দোঁহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎসনা
স্মিরিতি সাথে পীরিতি, আজি মন্দ্র-মধু মন্তরে ।

জ্যোৎস্না-মদিরা

চন্দ্র ঢালিছে তন্দ্রা নয়নে,
মল্লিকা বনে ঢালিছে মায়া ;
ছায়ায় আর্দ্র আলো খানি আজ
আলো মাখা ফিঁকে হাল্কা ছায়া !
সুদূর-স্বপন-বিধুর প্রাণ,
উঠিছে মৃদুল মধুর গান,
মৃদুল বাতাসে মর্ম্মর ভাষে
উছসি' উঠিছে বনের কায়া !
স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
গাহে অন্তর কত না ছন্দে,
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া !

কু ?

বসন্তের প্রথম ঊষায়
ফুলদলে জাগাবে বলিয়া
বহিল দক্ষিণ বায়ু ;—কে আজি সুধায়
মুহুর্মুহু আনন্দে গলিয়া ?—'কু ?'

মধু আলো, মধুর বাতাস
বুঝি তারে করেছে বিহ্বল,
ভুলে গেছে দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, দুখের আভাস,—
তাই সে সুধায় অবিরল—'কু ?'

সে যে আজ মেলেছে গো পাখা,
দেখেছে গো সৌন্দর্য্য অপার,
হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাখা,
তাই বুঝি পুছে বারম্বার—'কু ?'

বিধাতা করেছে তারে কালো,—
নীরব শিশিরে বরষায়,
তবু সে ফেলেছে বেসে জগতেরে ভালো
প্রেমোচ্ছ্বাসে তাই সে সুধায়—'কু ?'

মদন-মহোৎসবে

বন উপবন আলো ক'রে অশোক ফুটে আছে,
অশোক ফুলের রূপটি ঠাকুর ! চাইছি তোমার কাছে ;
চোখের দাবী মিটলে পরে তখন খোঁজে মন,
তাই তো প্রভু ! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।

মল্লিকা ফুল হাস্‌ছে হরি' হাওয়ার মগজ মন,
মনোহরণ বিদ্যাটি দাও—এ মোর নিবেদন ;
মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে শক্তি যেন হয়,—
নইলে, শুধু রূপের আদর—হয় না সে অক্ষয়।

আমের মুকুল জাগ্‌ছে আকুল ফলের আশা নিয়ে,
সফল কর আমায় ঠাকুর ! প্রেমের পরশ দিয়ে ;
প্রিয় আমার স্নেহের নীড়ে স্নিগ্ধ যেন রয়,
মনের মোহ ফুরিয়ে গেলেও প্রাণের পরিচয়।

গন্ধ-মধু-রূপ-সায়রে ভাস্‌ছে নীলোৎপল,—
নিখুঁৎ-নধর অটুট-আদর সোহাগ-শতদল ;
রূপে, রীতে, মাধুরীতে অম্‌নি হ'তে চাই,
চোখের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে যেন যাই।

মল্লিকা ফুল, আমের মুকুল, অশোক, নীলোৎপলে,
ঠাকুর তোমার চরণ পূজি,—পূজি নয়ন-জলে ;
অরুণ অরবিন্দ সম তরুণ এ হৃদয়,—
তোমার বরে কামনা তার সফল যেন হয়।

মধুমাসে

যে মাসেতে পুষ্পে মধু,—
মধু মধুকরের মুখে,—
হিয়া যখন হাওয়ার আগে
হয় গো মদির অধীর সুখে ;—
আঁখি আকুল অন্বেষণে
ফিরছে যখন বনে বনে,—
মুহুর্মুহু কুহু স্বরে
তন্ত্রী দুলে উঠ্‌ছে বুকে ;—
তখন তুমি দিলে দেখা অমনি
ফুলের বনে ফুলের রাণী রমণী !
অম্‌নি বিপুল সুখের ভরে
আকুল আঁখি উঠ্‌ল ভ'রে,
পুলক হাসি পাগল বাঁশী
বিদায় দিল মৌন দুখে !

গান

মুখখানি তার পদ্মকলি
ভাবের হাওয়ায় দোদুল্‌-দুল্‌ !
সুখের স্বপন, বুকের সে ধন,
দুখের আপন সে বুল্‌বুল্‌ ।

ভুবন-ভোলা নয়ন দু'টি
খোঁজে না ছল, নেয় না ত্রুটি,
ছুটির হাওয়া ছুটিয়ে সে দেয়,—
আপন-ভোলা মধুর ভুল !
উড়ো পাখীর লাগ্‌ল পরশ
তাইতো রে মন গেল উড়ে,
কি এক হাওয়া জাগ্‌ল সরস
স্বপন-সুখের ভুবন জুড়ে !
তড়িৎ-ভরা মেঘের মতন
হৃদয় জুড়ে জাগ্‌ল চেতন,
দেবতা সে কোন্ ছদ্মবেশে
কল্পলতার কাম্য-ফুল !

অবগুণ্ঠিতা

আমি বসনে ঢেকেছি মুখ
দেখিতে তোমায় !
দূরে স'রে যাই, বুকে
আঁকিতে তোমায় !
তুমি অভিমান-ভরে ফিরে যেয়ো না,
নিরাশ নয়নে বঁধু তুমি চেয়ো না ;
আমার ভুবন ভরি'
আছ দিবা-বিভাবরী,
আঁখির পুতলি ! হেরি
আঁখিতে তোমায় !

চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্ব্বাক,
সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্ব্বাক্, —
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।

হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যামলেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।

তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।

চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলি সম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।

"আজি যদি মঞ্জুভাষা আসে এই পথ দিয়া,
চকিতে আঁচলখানি নেব তার পরশিয়া,
সে যদি জানিতে পারে! সে যদি পালটি চায়!
মাগিয়া লইতে ক্ষমা আমি কি পারিব, হায়!

সে এলে অবশ তনু, কথা না জুয়ায় আর !
কত যেন অপরাধ,—আঁখি নোয় বারবার !
    সময় বহিয়া যায়, চ'লে যায় রূপসী,
    রাখিয়া রূপের স্মৃতি ডুবে যায় সে শশী।

*

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা !
        পিতা যদি সর্ব্বশক্তিমান
        পুত্র কেন তাপের অধীন ?
        পিতা যদি দয়ার নিধান
        পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন ?
নাহি—নাহি—নাহি হেন জন,
বিধি নাই—নাহিক বিধান ;
কোন্ ধনী পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান ?
        মোরা যে বিশ্বের পরমাণু
        স্নেহ প্রেম মোদেরো প্রবল ;
        আর যেই ত্রিলোকের পিতা
        তারি প্রাণ পাষাণ-নিশ্চল ?
দাসীপুত্র যারা জন্মদাস
ভয়ে ভক্তি জানি তাহাদের,
আজন্ম যে হ'তেছে নিরাশ,—
সেও রত তোষামোদে ফের !

ধিক ! ধিক ! মরণের দাস !
মুখে বল পুত্র অমৃতের !
ছিল দিন,—হাসি আসে এবে ;—
নখে চিরি' বক্ষ আপনার,
আমিও ক'রেছি লোহদান
লৌহময় পায়ে দেবতার ।
বালকের অখল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন ।
ফল তার ?—পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ !
মরণের পরে কিবা আর ?
নাহি—নাহি—নাহি কোনো জন ।"
অকস্মাৎ চাহিল চার্ব্বাক
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী !
মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি' পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস ।
পর্ণরাশি-মর্ম্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি' ;
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী ।

লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার ;
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার।
ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান ;
বাহুলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।
চাহিয়া, সহসা বালা ডাকিল চার্ব্বাকে
"ওগো! শোনো শোনো
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো?"
মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্ব্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর?
বিষম বিপাক!
কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদ্গদ বচন
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরণ ;—
যেয়ো একদিন!
আজ যাবে?" মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্ব্বাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে "না, না, আজ?—আজ থাক!"
আধেক বিস্ময়ে!
সহসা সংবরি আপনায়,
কহে বালা চাহি মুখপানে,

"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু
মৃত মৃগী কিরাতের বাণে ;
ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়,—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ ;
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন।
বল, আমি মা হ'ব তাহার।"
"তাই হোক্" কহিল চার্ব্বাক,
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি যুবা হইল নির্ব্বাক্।
কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চ'লে গেল মরাল গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে।
আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্ব্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে।
"ঠেকেছিল মনোতরী খান্
প্রাণ-নাশা সংশয়-চরায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।
যত কিছু ছিল বলিবার
না বলিতে হ'ল যেন বলা,
বোঝা—সোজা হ'ল মনে মনে,
ধুয়ে গেল যত মাটি মলা।

ছিল ঠেকে মনোতরী খান্,—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি দুর্জ্জেয় মহান্ ?
কে দেবতা এলে আশীষিতে ?
"এ আনন্দ কে দিলে আমায় ?—
আশা-সুখে মন পরিপূর !
এতদিন চিনি নি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর !"
রাত্রি এল ;—শয্যাতলে জাগিয়া চার্ব্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্ত্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার !
সেই একদিন শুধু জীবনে চার্ব্বাক
নত হ'য়েছিল নিজে চরণে ধাতার ;
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন,—
সে যে আনন্দের দিন,—সে যে প্রত্যাশার।

শূন্যের পূর্ণতা

কৃষ্ণ হ'তে পাংশু হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'তে ব্যাপ্তি ল'য়ে
শকুন্তের ছায়া ক্রমে আলোকে মিলায় !
জিজ্ঞাসা সংশয়-শেষে, দগ্ধ রিক্ত চিত্ত দেশে
অনাসক্ত পূর্ণজ্ঞান বিহরে লীলায় !

সহজিয়া

ফুলের যা' দিলে হ'বে নাকো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ,
আমি চাই সেই সৌরভ,—শুধু—
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া
আমি চাই মধু-মশ্‌গুল্‌ হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।

বৃন্তটি হ'তে ছিঁড়িতে না চাই
দিতে নাহি চাই দুখ,
সহজ প্রেমের অমল আমোদে
ভরিয়া উঠুক্‌ বুক!
খাঁটিতে না চাই দুনিয়ায় মাটি
তারি মাঝে মিশে রয়েছে যা' খাঁটি,
নিতে হ'বে সেই পরশ মণির
চুম্বিত সোনাটুক্‌,
কারো কোনো ক্ষতি হ'বে না, অথচ
আমার ভরিবে বুক।

লীলার ছল

আমি যদি চাই, অবগুণ্ঠনে
তুমি মুখখানি ঢাক ;
নয়ন ফিরালে, তবে, অনিমিখে
কেন গো চাহিয়া থাক !
এমনি করিয়া চিরদিন কিগো !
জড়ায়ে রাখিবে মোরে ?
তবু কাছাকাছি হবে না ? আমার
জীবন দিবে না ভ'রে ?
নয়ন তোমার করে অনুনয়,
তুমি দূরে স'রে থাক !
লীলায় হেলায় মেঘের মেলায়
রঙীন্ স্বপন আঁক !
পূজা চাও তুমি হৃদয়-প্রাণের
হায় গো পাষাণ-দেবী !
তবুও আমায় ধন্য হইতে
দিবে না তোমায় সেবি' !
ফাগুন ফুরায় ফুল ঝ'রে যায়
ওগো কৌতুক রাখ,
হৃদয়ের পুরে পরিচিত সুরে
ডাক গো বারেক ডাক ।

লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি !   সাধনার ধন !
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির-আকিঞ্চন !
করুণ-লোচনা !
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা।

মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জোছনারি মত তবু অঙ্গে গ্লানি নাই !
অয়ি ইন্দুলেখা !
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা।

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে,
ফিরি নাক' দেশে দেশে নিষ্ফল সন্ধানে ;
হে অমৃত-ধারা !
উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হ'য়ে গেছে সারা।

এসেছ হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি' দশ দিক মন্দার সৌরভে ;
আমি মুগ্ধ চিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমারি ইঙ্গিতে !

আপনি মগন হ'য়ে গেছি আপনাতে,
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে !
যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ ? হায়, কে তা' জানে !

সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস,
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস,
আনিলে চেতনা,
দুখের গদ্গদ সুখ, সুখের বেদনা !

ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে !

আজি মোর সর্ব্ব চিত্ত সারা তনু ভরি'
আনন্দ অমৃত-ধারা ফিরিছে সঞ্চরি' !
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে !

জীবনে এসেছ পূর্ণা ! রিক্তা-তিথি-শেষে,
মানসী দিয়েছ দেখা মানুষের দেশে,
অয়ি স্বপ্ন সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি'।

তুমি সে বালিকা যার চম্পক অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি !

যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া।

শিয়রে সোনার কাঠি ঘুমাইতে তুমি,
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি'
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত বাতাস,
বর্ষা-জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস!
মূর্চ্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্য-মণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালোচুল খুলে,
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দুলে;
সন্ধ্যা সরোবরে
গন্ধতৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে স'রে!

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে;
আজ একেবারে
মর্ত্ত্যে এলে মূর্ত্তি ধ'রে আমারি দুয়ারে!

মুগ্ধ মোরে ক'রেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি,'—
ধুয়ে মুছে দেছ গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি,
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী।

প্রিয়-প্রদক্ষিণ

প্রিয়ার ও তনু অতনু সে কোন্
-দেবতার মন্দির !
বন্ধনহীন মন উদাসীর
আলয় সে শান্তির।
তাহারে ঘিরিয়া ঘুরিছে হৃদয়
ঘুরিছে রাত্রিদিন,
উৎসুক সুখে কৌতুকে তারে
করিছে প্রদক্ষিণ !

ফিরিছে হৃদয় কুন্তলে তার
ফিরিছে কপোলে, চোখে ;
অধরে, উরসে, চরণে পাণিতে
ফিরিছে তাম্র-নখে !
ফিরিছে আঙুলে, ফিরিছে জড়ুলে,
ফিরিছে ভুরুর তিলে,
ফিরে অবিরাম,—কৌতূহলের
অন্ত নাহিক মিলে।

ঘুরি গো যাত্রী দিবস রাত্রি
অনুপ দেউল ঘিরে,
নূতন প্রেমের নির্ম্মল-করা
'নির্ম্মালি' ধরি' শিরে !

কত হাসি কত পুলক-অশ্রু
করি গো আবিষ্কার,
দৈব প্রসাদে খোলে দেউলের
নূতন নূতন দ্বার !

নূতন প্রণয় নব পরিচয়
নব রাগিণীর গীতি,
কত জনমের মূর্চ্ছনা তাতে
মূর্চ্ছিত কত স্মৃতি !
প্রিয়ার দিঠিতে ভোলামন আজ
হয়েছে জাতিস্মর,
দৈব আলোকে ভ'রেছে ছু'চোখ
ভরেছে নীলাম্বর !

প্রিয়ার রূপের অন্ত নাহিরে
নূতন সে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে তার শোভা নব নব
হেরি বিস্ময় মনে !
উদ্বেল তাই হৃদয়-পরাণ
নাচিছে রাত্রি দিন ;
নিবিড় পরশ আঁখি সনে করে
প্রিয়ারে প্রদক্ষিণ !

তুমি ও আমি

তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে ;—ছিলাম যখন পাপ্‌ড়ি-ঘেরা সিংহাসনে ;
আমার ছিল সোনার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্য-কেশর আমি তোমার ছিলাম পাশে।

হঠাৎ কি যে মর্জ্জি হ'ল,—হঠাৎ কেমন হ'ল মতি
তফাৎ হয়ে গেলাম দোঁহে,—বিমুখ পরস্পরের প্রতি !
দীর্ঘ দিনের তপস্যাতে কায়্‌মী হ'ল ছাড়াছাড়ি,
আমি ক্রমে হ'লাম পুরুষ, তুমি প্রিয়ে হ'লে নারী।

তফাৎ হয়েই ফুট্‌ল আঁখি,—দেখ্‌তে পেলাম পরস্পরে—
ভিতর থেকে টান পড়েছে,—চল্‌বে নাকো থাক্‌লে স'রে ;
'নোল্' দিয়ে তাই এগিয়ে এলাম,—এগিয়ে হ'টে গেলাম পিছে,
মান অভিমান জাগ্‌ল দারুণ,—মিলন বাধা বাড়ল মিছে।

আজ বিরহের দারুণ দাহে পরস্পরে চাইছি মোরা,—
আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় চোখের জলে ঝরছে ঝোরা ;
আর মিলনের নেইক আশা মৌমাছিদের ঘট্‌কালিতে,
ভাঙা এ মন জুড়তে এখন হচ্ছে নিতি জোড়-তালিতে !

তফাৎ হ'য়ে নেইক তৃপ্তি, দু' ঠাঁই হ'য়ে দুখ মেনেছি,
লাভের মধ্যে, হায় গো বিধি, হারিয়ে-পাওয়ার স্বাদ জেনেছি ;
হারিয়ে-পাওয়া ! গভীর সে সুখ !—প্রবল সে যে দুখের বাধায় !
বিচিত্র সে নূতন মিত্র !—এক সাথে সে হাসায় কাঁদায় !

ফুল জনমে অভেদ ছিলাম,—যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে,
আজ আমাদের এই মিলনে সেই কথাটিই জাগ্‌ছে মনে ;
দূরে স'রে দুনিয়া ঘুরে আবার মিলন এই জনমে,
মুক্ত দোঁহার যুক্ত হৃদয় আজ বিধাতার পায়ে নমে।

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম,
ফিরিছে মন্থর বায়ু পাতায় পাতায় ;
মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
মেতেছে ছেলের দল পাড়ায় পাড়ায়।
সশব্দে বাঁশের নামে শির,—
শব্দ করি' ওঠে পুনরায় ;
শিশুদল আতঙ্কে অস্থির
পথ ছাড়ি' ছুটিয়া পালায়।
স্তব্ধ হ'য়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
রৌদ্রের বিষম ঝাঁঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে ;
বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায় রাখাল,
বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে।
পাতা উড়ে ঠেকে গিয়া আলে,
কাক বসে দড়িতে কুয়ার ;
তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে,
ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার।

—

অকারণ

শূন্য যখন গাঙিনীর তীর,
পথে কেহ নাহি চলে,—
পড়ে নাক দাঁড় খেয়া তরণীর
তিমির-মগন জলে,—
নীলাম্বরীর অঞ্চল দিয়া
সন্ধ্যা সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
গন্ধ তৃণের বিভোল গন্ধ
বাতাসের কোলে ঢলে ;—
করুণে মুরলী বাজে পরপারে,
দীপ জ্বলে নিবে কিনারে কিনারে,
সুখ নীরে পাখী ঘুম-ভরা আঁখি
স্বপনে কি যেন বলে ;—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে—অশ্রু ছলে।
যবে ঝর ঝরে বারিধারা ঝরে
আর সব রহে চুপ—
তরু পল্লবে সঞ্চিত জল
জলে পড়ে—টুপ্ টুপ্,—
যবে ঘুমন্ত কেতকীর শাখে
জড়ায়ে নিভৃতে সুনিবিড় পাকে
গন্ধ-মগন কাল ভুজঙ্গ
শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠে ;—

দাদূরীর ডাকে ভরি' উঠে বন,
দাপটিয়া ফিরে দস্যু পবন,
নব কদম্ব যূথীর গন্ধ
আকাশে বাতাসে লুটে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে অশ্রু ফুটে !

প্রথম শরতে অম্বরে যবে
মেঘ-ডম্বরু বাজে,—
যবে খরশাণ বিধাতার বাণ
ঝলসে গগন মাঝে,—
কমল কলিকা শঙ্কিত মনে
রহে নতমুখে মুদিত নয়নে,
তরুণ অরুণ কিরণ স্মরিয়া
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে,—
ব্যাকুল পরাণ খুঁজে আশ্রয়,—
খুঁজে সে শরণ চাহে সে অভয়,-
এ তিন ভুবনে আপনার জনে
খুঁজি' মরে সকাতরে,—
উছসি' উঠিয়া বিরহী এ হিয়া
নয়ন—সলিলে ভরে।

পউষের রাতে কঙ্কাল সম
বিথারি' রিক্ত শাখা,
কাঁদে যবে তরু ভিজিয়া শিশিরে
ভস্ম-কুহেলি মাখা,—

কুক্কুর তুলে বুক্কন ধ্বনি,
ঘুৎকার করে উলূক অমনি,
উত্তর বায়ু শীতের প্রতাপ
প্রচারে ভূমণ্ডলে,—
দীর্ঘ যামিনী পোহায় জাগিয়া—
তপ্ত হিয়ার পরশ মাগিয়া,
পরাণ ক্ষুণ্ণ নয়ন শূন্য
নিবিড় তিমির তলে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছলিয়া,
নয়নে মুকুতা ফলে।

এ কি বিধুরতা হায় রে বিরহী!
কালে কালে নিতি নিতি!
এ কি রে দহন রহি' রহি' রহি'
একি অপরূপ গীতি!
এ কি মিছামিছি দুঃখের খেলা,
এ কি মিছামিছি আঁখিজল-ফেলা!
কোন্ বেদনার চির হাহাকার
চিরদিন জাগে প্রাণে!
কোন্ খানে সুরু, কোথা উন্মেষ,
কোন্ যুগে হায় হ'বে এর শেষ,
কোন্ রাগিণীর ব্যথা-ভরা রেশ
ধ্বনিছে সকল গানে!
অকারণে হায় অশ্রু গড়ায়
কোন্ সাগরের টানে!

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে !
পাল্কী চলে !
গগন-তলে
আগুন জ্বলে !
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা !

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে
ঢুল্‌ছে ক'সে !
দুধের চাঁছি
শুষ্‌ছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্ ভনিয়ে !—
আস্‌ছে কা'রা
হন্ হনিয়ে ?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক্ দু'পুরে
ধায় হাটুরে !

কুকুর গুলো
শুঁক্‌ছে ধূলো,—
ধুঁক্‌ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুক্‌ছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে!

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—
দুল্‌কি চালে
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,—
জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্‌ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে!
তপ্ত তামা,—
যায় না থামা,—
উঠ্‌ছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়,—
পাল্‌কী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায়!

ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে !
মেঠো জাহাজ
সাম্‌নে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে !

কাজ্‌লা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমী
ঝিমায় দূরে !
ধানের জমী
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া !

'সামাল্' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ্দ তারা !
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারি ;
মাঠের শেষে
তালের সারি।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে

চিল্ ফুকারে
মাঠের পারে।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা!

বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা;
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে!—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

পেরজাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?—

পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায় !

পাল্কী দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে !

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা !
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরু মশাই
দোকান করে !

পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে,
ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে ;
টাট্‌কা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কী মাঠে
নামল ধীরে ;
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্‌কী মাতে
আপন নাটে !

শঙ্খ-চিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে !

তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে !
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে ;
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।

পাল্কী চলে রে !
অঙ্গ ঢলে রে !
আর দেরী কত ?
আরো কত দূর ?
"আর দূর কি গো ?
বুড়ো-শিবপুর
ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য্য ঢলে !
পাল্কী চলে !

মুগ্ধা

ওই রূপে মোর মন ভুলেছে, ভরেছে মন মোহন রূপে !
জেগে তোমায় স্বপন দেখি, তোমার রূপে যাচ্ছি ডুবে !
ওগো আমার দখিন হাওয়া ! অসীম তোমার দক্ষিণতা,
ওগো আমার তমাল ছায়া ! তপ্ত জনের ঘুচাও ব্যথা ;
ওগো শ্যামল শাঙনী মেঘ ! স্বপ্নে তোমায় চায় যে যুথী,
ওগো আমার গায়ক গুণী ! ওগো আমার গানের পুঁথি !
এই গিয়েছ কাছটি থেকে,—ভাবছি ছুটে যাই এখুনি,
বাড়িয়ে-বলা নয় গো এ নয় ভালবাসার-ভুল্-বকুনি ;
হায় গো বিধির এম্‌নি বিধান মিলন-বেলাই অল্প-আয়ু,—
শীতের বেলার চেয়েও খাটো,—বইছে তবু দখিন বায়ু !
ফুল-জাগানো দখিন হাওয়া,—দিল্ জাগানো দক্ষিণতা ;
মিলন-মেলা যায় ফুরায়ে, ফুরায় না হায় মনের কথা ।
দূরে কেন যায় গো লোকে,—আমি যে চাই থাক্‌তে কাছে,
আনাগোনা ফুরিয়ে দিয়ে কাছে থাকায় দোষ কি আছে ?
এসো কাছে প্রিয় আমার—এস আমার জনম ভরি' ;
একলা ঘরে ওগো ! আমি তোমার কথা স্মরণ করি !
আস্‌তে তোমায় হবেই হবে—অগৌণেতেই আস্‌তে হবে,-
জেগে ভাল ফেল্‌লে বেসে—স্বপ্নে ভাল বাস্‌তে হ'বে ।

৩

সাড়ে চুয়াত্তর

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই।
ভাব্‌ছি আমি কোথায় তুমি হায় সে কতদূর,
কোথায় সহর কল্‌কাতা আর কোথায় কুসুমপুর!
না জানি কি ভাব্‌ছ এখন করছ কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছ কথা? পরেছ কোন্ সাজ?
ইচ্ছা করে হাওয়ার ভরে তোমার কাছে যাই,
করছ যে কি পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই।
ইচ্ছা করে শুন্‌তে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঢের!
ইচ্ছা করে কত কি যে—সাধ যে জাগে আজ,—
শাদার পরে কালি দিয়ে লিখ্‌তে সে পাই লাজ।
তবে যদি না পড় সে দিনের বেলায় আর
তবে লিখি,—লিখ্‌তে সে লোভ হচ্ছে যে বাররার!
হচ্ছে সে লোভ, কিন্তু, ওগো!—পড় না এর পর,
আমার চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুয়াত্তর;
এইখানে শেষ করতে হবে দিনের বেলার পাঠ,
রাতের পড়া রাত্রে হবে, ভাঙলে লোকের হাট।
বাকিটুকু শোবার বেলায় বন্ধ ক'রে ঘর
একলা খুলে দেখ্‌তে হ'বে রেখে শেষের পর;
সেই গোপনে মনে মনে পোড়ো চিঠির শেষ,
নিদ্-মহলে বন্ধু! আমার আর্জ্জি হ'বে পেশ।

সেই গোপনের আবরণে, জানাই তোমার পায়,—
একটি তোমার চুমার লাগি পরাণ কাঁদে, হায় !
দিয়ো দিয়ো একটি চুমা আমার চিঠির গায়,
প্রদীপ যদি হাসতে থাকে নিবিয়ে দিয়ো তায়।
দাও যদি সে পাবই আমি, পাবই আমি টের,
হাওয়ার আগে হ'বে বিলি বার্ত্তা হৃদয়ের।
আস্‌বে স্বপন তোমার বেশে মুদ্‌লে আঁখির পাত,
কাট্‌বে সারা রাত্রি সুখে বন্ধু ! প্রিয় ! নাথ !
দূর থেকে সুর লাগবে বীণায়,—জাগ্‌বে গো অন্তর,
আমার চিঠির মাঝখানে তাই সাড়ে চুয়াত্তর।

নাগ পঞ্চমী

হায় ! প্রতি বৎসরে
হাজার হাজার সোনার মানুষ নাগ-দংশনে মরে !
সেই নাগে মোরা পূজি !
সর্প-পূজার মন্ত্রের লাগি' বেদ-সংহিতা খুঁজি !
নাগ-পঞ্চমী করি !
গ্রন্থিল বাঁকা হিন্তাল-শাখা ধরিতে আমরা ডরি !
দুধকলা দিই সাপে !
পূজা খেয়ে খল দংশন করে !—মরি গো মনস্তাপে।
জানিনে কিসে কি হয়,—
মৃত্যুরে পূজি' অমরতা লাভ,—কিছু বিচিত্র নয় !

গ্রীষ্মের সুর

হায় !
বসন্ত ফুরায় !
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্ম্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে !
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্বল-অনিমিখ,
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক্ !
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায় ;
হায় !

হায় !
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ ।
সংবর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর !
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর ?
সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে !
তৃপ্তি নাহি পায় !
হায় !

হায় !
সান্ত্বনা কোথায় ?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উষ্মা-মনে ;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায় !
হর্ম্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি-কণা ক্ষরে,
হাতে মাথে ধূনী জ্বালি' বসুন্ধরা কৃচ্ছ্র ব্রত করে ;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু আমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায় !

হায় !
হৃদয় শুকায় !
নাহি বল, নাহিক সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল !
মূক হ'য়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্ ধুক করে শুধু প্রাণ।
কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা বা করিবে অনুযোগ ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদেকে নিঃস্ব নিরুদ্‌যোগ !
নাহি বাষ্প বিন্দু নভে,—বরষা সুদূর ;
দগ্ধ দেশ তৃষায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায় ;
হায় !

অন্তঃপুরিকা

আর যে আমার সইছে নারে সইছে না আর প্রাণে,
এমন ক'রে কতদিন আর কাট্‌বে কে তা' জানে !
দিন গুণে দিন ফুরায় নাকো নিমিষ গণি তাই,
বুকের ভিতর হাঁফিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই।
যে খান্‌টিতে বস্‌ত সে জন বস্‌ছি সেথায় গিয়ে,
দেখ্‌ছি খুলে চিঠিটি তার ঘরে দুয়োর দিয়ে ;—
বেশী আমি পাইনি যে গো পাইনি বেশী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি একটি চিঠি তার।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে,—হাস্‌ছি মনে ক'রে,
দেখ্‌তে হঠাৎ ইচ্ছে হ'য়ে চক্ষু এল ভ'রে।
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তার লিখি,
হয় না কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভ'রে দেখি।
নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও কেন ছাই,
মনটা ওঠে আকুল হ'য়ে, উদাস হ'য়ে যাই।
ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চ'লে,
সকল ব্যথা সইত, মাথা রাখতে পেলে কোলে।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী,—প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি দুখ অযোধ্যায়।

আনন্দ-দেবতার প্রতি

এস প্রমোদ! পুলক! রভস হে!
আমি মুছেছি অশ্রুধার;
আজ মুকুল নহে তো অবশ হে!
তায় নীহার নাহিক আর।

আজ ধরণী আঁচলে আবর' গো!
যত কালিকার ঝরা ফুল,
পাখী কাকলি-কূজনে কুহর' গো
নদী গাহ গাহ কুলুকুল!

তবু নীহারে শিহরে ফুলদল!
পাখী নীরব পুনর্ব্বার!
নদী ভাসাইয়া আনে অবিরল
শুধু চিতার ভস্মভার!

আমি শ্মশানে বাসর রচিব গো
পরি' শুষ্ক ফুলেরি হার,
আমি নয়ন উপাড়ি রুধিব গো
এই নয়নের বারিধার।

এস রভস-দেবতা! বঁধুয়া হে!
তুমি এস সখা একবার,
আমি রাখিব রাখিব রুধিয়া হে!
এই নয়নের বারিধার।

দরদী

(বাউলের সুর)

মনের মরম কেউ বোঝে না !
(এরা) হাস্‌লে কাঁদে, কাঁদ্‌লে হাসে !
(আহা) দরদ দিয়ে কেউ দেখে না
(ওগো) গরজ নিয়ে সবাই আসে ।
(যেজন) হিয়ার হাসি কান্না বোঝে
(ওগো) ছিলাম আমি তারি খোঁজে,
(হায় রে) কাট্‌ল বেলা ভাঙল মেলা
(তবু) বসেই আছি আসার আশে ।
বন্ধু ! তোমায় বল্‌ব বা কি ?
আড়াল থেকেই মিলাই আঁখি
(আমি) প্রাণের খবর পাইনে চোখে
(শুধু) মুখ-চাওয়া সার দ্বারের পাশে
(ওগো) মরমী কেউ মিল্‌ত যদি
(তবে) বইত উজান জীবন-নদী—
(ওগো) নিরবধি সেই দরদীর
(মোহন) বাঁশীর সুরে প্রেমোল্লাসে !

রিক্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চলে' গেছে বুল্‌বুল্‌,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে ?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্ত্তি চূর্ণ,
বেলা চলে' গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

কনক-ধুতুরা

কনক-ধুতুরা ! কনক-ধুতুরা !
পরিপূর তুমি বিষে ;
ও তনু-পাত্রে অতনু-সুষমা
উপচি' উঠিল কিসে ?

তুমি অপরূপ ওগো রূপবতী !
অপরূপ তব কথা !
মুকুলিত করি' তুলিছ কেবলি
মৃত্যু ও মাদকতা !

উথলি' উঠিছে একটি বৃন্তে
দুখের সঙ্গে সুখ,
মৃত্যু-অভেদ জীবন-নৃত্য !—
মন করে উৎসুক !

সোনার গেলাসে মুগ্ধ মদিরা !-
কর্ণে কী কথা জপে !
ফেনগুঞ্জনে মত্তলোচনে
মৃত্যুর হাসি সঁপে !

কনক-ধুতুরা ! কনক-ধুতুরা !
কিসে তুমি পরিপূর ?
মুগ্ধ নয়নে আমি তোর পানে
চেয়ে আছি তৃষাতুর ।

চাতকের কথা

হে সরসী ! তুমি স্বচ্ছ শীতল,—
বলেছে আমায় অনেক পাখী ;
হায়, আমিও তৃষিত, তবু তোর পানে
নারিনু নারিনু ফিরাতে আঁখি !

তুমি সুন্দর, তুমি সুবিপুল,
সুলভ তোমার আগাধ বারি,
মোর সমুখে রয়েছ নিশিদিনমান
তবু তো ও জল ছুঁইতে নারি !

নিয়ত আকাশে আশাপথ-চাওয়া,
নিত্য নিয়ত তৃষার জ্বালা,
তবু তোর 'পরে মোর ফিরিল না মন,
হায় গো রূপসী সরসীবালা !

ওগো বাঁধাজল ! করি' কোলাহল
দর্দ্দুরদল বন্দে তোরে,
হায় কাকের ভেকের তুমি আরাধ্যা
আমি তোরে সেবি কেমন ক'রে ?

নিন্দা তোমায় করিনে গো আমি,—
নাই নাই মনে ঘৃণার কণা ;
হায় খেলা-ছলে হেলা করিনে তোমায়,—
পাই নি তেমন কুমন্ত্রণা।

তৃষ্ণা আমায় দিয়েছেন বিধি,—
সে তৃষা ফটিক-জলের তৃষা,
ওগো শান্তির আশা সুদূর আমার,—
দহন আমার দিবস নিশা!

আমি মেঘের রন্ধ্রে করি আনাগোনা,
বিজলীতে জ্বলি' ফুকারি 'ত্রাহি'!
তবু উধাও-ধাওয়ার হঠাৎ-পাওয়ার
চকিত-চাওয়ার তুলনা নাহি।

ওগো বিধাতা আমায় এমন করেছে,—
দুষ্কর ব্রতে করেছে ব্রতী;
তাই পুষ্কর মেঘে মজে আছে মন,
নাই সে পুষ্করিণীর প্রতি।

হে সরসী! তুমি তারার আরসী,—
স্বচ্ছ অগাধ আরামে ভরা;
তবু আকাশে জলের রয়েছে যে দ্রোণী
সেই চাতকের তৃষ্ণা-হরা।

ঝোড়ো হাওয়ায়

ঝোড়ো হাওয়ায় রোল উঠেছে কোলাহলের সাথ!
আকাশ জুড়ে অকালে ওই ঘনিয়ে আসে রাত!
আজ্‌কে যারা ফিরত ঘরে
হারাল পথ পথের 'পরে
ধুলায় আঁখি বন্ধ, হ'ল অন্ধ অকস্মাৎ!

ডাঙায় গাছের ডাল টুটিছে, বিষম ডামাডোল,
জলে নায়ের হাল ছুটিছে,—বোল্ রে হরি বোল !
তূর্ণ ছোটে ঘূর্ণি হাওয়া
ফুরায় বুঝি পারে যাওয়া ;
পান্থ পাখী পাল্‌টে পাখা নিল মাঠের কোল ।

যোজন জুড়ে মেঘে মেঘে বজ্র-আকর্ষণ,
বহুক হাওয়া ক্ষুরের ধারে,—হ'বে সুবর্ষণ ।
গম্ভীরা যে বুকের 'পরে
বসে আছে আড়ম্বরে,—
দম্ভটা তার খর্ব্ব হ'বে,—এ তার নিদর্শন ।

ঝোড়ো হাওয়ার রোল শুনে আজ মেতেছে পরাণ !
সব্‌ধানী ! তুই আজ্‌কে কারে করিস্ রে সব্‌ধান ?
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে
নাচে মিলন-অনুরাগে,
বাহুতে তার মিলিয়ে বাহু গাইতে হ'বে গান !

ঝড়ের তালে নাচ্‌বে ধূলি উড়িয়ে ধূসর কেশ ;
রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে—জুড়িয়ে যাবে দেশ ।
স্বর্গ হ'তে গঙ্গা ঝ'রে
দিবে ভুবন স্নিগ্ধ ক'রে ;
কুম্ভীরের ওই জিহ্বা-তালুর ঘুচ্‌বে পিঙ্গ বেশ ।

জানি আমি অপূর্ব্ব ওই রুদ্র গঙ্গাধর,
যেথাই দাহ সুদুঃসহ সেইখানে তার ভর ।

দুখের আদি,—সুখের নিদান,—
তারি বরে দুঃখ-নিধান
মরণ করে অমৃত দান, শিব সে—ভয়ংকর !

ছুটুক না সে রুদ্র মরুৎ নাই তো কোনো ভয়,-
চেতন-জড়ে না হয় হবে পাগড়ী-বিনিময় ;
নিশ্বাসে যাঁর ঝঞ্ঝা ছোটে,—
প্রশ্বাসে প্রশান্তি ফোটে,—
তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে মোরা মরণ করি জয়।

বজ্র কামনা

হায় শূন্য জীবন নীরস হৃদয়
নীরব দহনে দহে,
আর লুপ্ত অশ্রু মরমের তলে
ফল্গু-ধারায় বহে ;
ওগো রুদ্র আকাশ নিথর বাতাস
অন্ধ হুতাশে ভরে,
আজ বরষণ-লোভে বিবশা ধরণী
বজ্র কামনা করে।

হায় কুম্ভীরকের পিঙ্গল তালু—
আকাশ পিঙ্গ ছবি,
তার জিহ্বার মত প্রান্তর ঢালু
রৌদ্রে শুষিছে রবি ;

হায়　　খাকী রঙে খাক হ'ল দুই আঁখি
　　　　দুনিয়াটা গেল খ'রে,
তাই　　ঘন-বরষণ-লালসে ধরণী
　　　　বজ্র কামনা করে !

আজ　　সুখ্ নাহি দেহে বিশ্রাম গেহে
　　　　স্বস্তি নাহিক প্রাণে,
যেন　　আঙার-ধানীর বাষ্প বিভোল্
　　　　শ্বসিছে সকল খানে !
নাই　　নাই ফুল ফল, ফলে নি ফসল
　　　　ধূ ধূ ধূ তেপান্তরে,
হায়　　ফলের লালসে বন্ধ্যা ধরণী
　　　　বজ্র কামনা করে ।

ওগো　　হিল্ মিল্ কবে বহিবে সলিল
　　　　ফেণমুখ ফণা তুলি' ?
আর　　ঝিল্ মিল্ কবে দুলিবে সমীরে
　　　　তাজা অঙ্কুরগুলি ?
ওগো　　খালি কোল কবে ভরিবে আবার—
　　　　আর কত দিন পরে ?
হায়　　সফলতা লাগি' মৌনে ধরণী
　　　　বজ্র কামনা করে !

ওগো　　বজ্রের রাজা অস্ত্র তোমার
　　　　হান একবার বেগে,—
এই　　ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস
　　　　পরিণত হোক্ মেঘে ;

ওগো　ঘনায়ে মিলায়ে কর সুনিবিড়
তড়িত-জড়িত স্বরে,
আজ　বধ-ভয় ভুলি' বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র-কামনা করে।

ওগো　বজ্র-দেবতা বজ্র তো শুধু
বধের যন্ত্র নয়,
ও যে　বন্ধ্যা-জনের সন্তাপ-হারী,—
বন্ধন করে ক্ষয় ;
ও যে　মিলন ঘটায় কাঞ্চন-ডোরে
ধরণী ও অম্বরে
তাই　বন্ধ্যা ধরণী মরণ-দোসর
বজ্র কামনা করে।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্ ;
গ্রীষ্মের হোক্ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক্ তান,
যক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ!

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায়;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব! পূজ্য! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ! বন্ধু! দৈবের ঘুচাও ভুল!

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই!
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্ম্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক্;
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ!

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়,হায় মেঘ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ;
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক্" বন্ধু! বন্ধুর আশীষ লও।

দুর্দ্দিনে

মলিন আঁচল চক্ষে চাপিয়া
কে তুমি ভুবনে এলে,
অসীম অকুল দুর্ভাবনার
পাংশুল ছায়া মেলে !
হে নীরবচারী, বুঝিতে না পারি
মুখে কেন নাহি ভাষ,
কোন্ অশ্রুর অতলে ডুবিয়া
হিম হ'য়ে গেছে শ্বাস ?

ছিন্ন-বসন ! রিক্ত-ভূষণ !
গভীর-শ্বসন ! ওরে !
কেন গুমরিয়া উঠিস্ কাঁদিয়া ?
কি বেদনা বল্ মোরে।
বিহ্বল সুর ডাকে দর্দ্দুর,
চাতক উড়িয়া বসে ;
মদালস তব মূরতি—সে কোন্
শোকের মাদক রসে !

সহসা শিহরি' চীৎকার কেন
করিলি, রে উন্মাদ,
রুদ্ধ ব্যথার রূঢ় তাড়নার
এই কি আর্ত্তনাদ !
ত্রাসে মুদে এল বিশ্বলোকের
আয়ত চোখের পাতা,
আধা শাদা হ'য়ে গেল শঙ্কায়
বিকচ নীপের মাথা !

অকালে দিনের আলোক হরিয়া
কে এলে গো চুপে চুপে,
বিজুলির হাসি পাণ্ডুর করি'
দেখা দিলে ছায়ারূপে !
আঁচল তোমার তিতিয়া ভূতলে
অশ্রু ঝরিয়া পড়ে,
বেদনায় তরু-বল্লরী বীথী
এ পাশ ও পাশ নড়ে।

ওগো তুর্দ্দিন ! কে পূজিল তোমা
ভুঁই-চাঁপা ফুল দিয়া !
চাঁদ-আঁকা পাখা দোলায় ময়ূর
বিস্ময়াকুল হিয়া।
মূর্চ্ছিত ধরা আঁখি মেলে, তোরে
পাইয়া ব্যথার ব্যথী,
খুলে গেল তার হাজার নেত্র,
ফুটিল হাজার যূথী !

ওগো কামচারী ! সন্তাপহারী !
অন্তর তুমি জানো,
বিষাদের বেশে এসে দেখা দাও,
ব্যথিতে বক্ষে টানো ;
অশ্রু ঘুচাতে, ব্যথিতের সাথে
অশ্রু মিশাতে হয়,—
তুমি তাহা জানো, বন্ধু পুরাণো !
দুর্দ্দিন সহৃদয় !

ওগো দেবতার অশ্রু প্লাবন !
তোমার পাবন-ধারে
মলিনতা তাপ ঘুচাও মহীর
উর্ব্বর কর তারে ;
নীল পদ্মের মথিত নীলিমা
ব্যথিত চক্ষে দাও,
ঘন চুম্বন দান কর, ওগো,
বুকে নাও ! বুকে নাও !

গান

মন ! আমার হারায়ে যা' রে !
(তোর) কাজ কিরে আর কুল কিনারে ?
কান্না হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে
অকুল পানে চল্‌রে বেয়ে
(যেথা) কুল ভাঙে না বান ডাকে না—
তরঙ্গ নেই যে পাথারে !

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে !
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই !

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে ;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রা গুলোকে !

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে !

ময়ূর বলে 'কে গো ?' এযে আকুল করা রূপ !
ভেকেরা কয় 'নাই কোনো ভয়', জগৎ রহে চুপ ;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়্‌ছে ধরার গায় ।

কোন্ মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল্ হাওয়ায় আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে ;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে !
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত !

রামধনু

পুণ্য আখণ্ডল-ধনু মণ্ডিত কিরণে,
রমি তুমি জলদের নীল শিলাপটে,
স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে
রচিত ও তনুচ্ছদ ; ধূর্জ্জটির জটে

ধূপছায়া শাটি-পরা জাহ্নবীর মত
মেঘমাঝে মূর্ত্তিখানি মনোজ্ঞ তোমার ;
শ্যাম অঙ্গে রাখী সম, শোভন সতত ;
হর্ষ-কলতান বিশ্বে তোল বারম্বার !

ইন্দ্রধনু তুমি কিহে পুরাণ-বর্ণিত ?
কিম্বা রামধনু নাম যথার্থ তোমার ?
প্রজা-বৎসলের কর করি' অলঙ্কৃত
লভিছ কি আজো তুমি শ্রদ্ধা সবাকার ?

রামধনু ! রামরাজ্য অতীতে বিলীন,
তুমি তারি রম্য-স্মৃতি চির-অমলিন।

তখন ও এখন

(রুচিরা)

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল্‌-বাতাস লেগে ;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা ?
বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ায় ভাসে।

এখন বিভায় মহামহিমায় আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ;
এখন তাহায় চেনা হ'বে দায় নূতন বেশে,
তরুণ কুমার কোলে আজি তার হাসায় হেসে।
লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও ত্বরা,
বাসর রাতির সাথীটি—সে আর না ভায় ধরা ;
এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,
বিলোল চপল বিজুলি এখন লুকায় লাজে।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাঁতি,
কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাথী ;
বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,
খেলার পুতুল কোথা পড়ে' ?—আজ খবর নাহি !
পুতুল পরাণ পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,
নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে !
নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,
নূতন দুয়ার দেউলে ফুটাও নিশির শেষে।

প্রাবৃটের গান

দাঁড়া গো তোরা ঘিরিয়া দাঁড়া নীরব নত নেত্রে,
দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে !
শুনিস্ নে কি ঘর্ঘরিয়া
চলেছে কে ও স্বর্গ দিয়া,
গগন-পথে বিপুল রথে হেলায়ে হেম বেত্রে !

আবৃত-করা প্রাবৃট্ এল মেলিয়া মেঘ-পক্ষ,
বিবশা ধরা বিতথ বেশ, শ্বসিছে মুহু বক্ষ।
অজানা ভয়ে অচেনা সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি' আঁখির থির লক্ষ্য !

বৃহৎ সুখে বৃংহিতে কি দিগ্‌গজেরা গর্জ্জে ?
মিলাবে কিও অমরা ধরা আকাশ ভাঙি' বজ্রে ?
ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে
অর্ঘ্য ধরি' স্বন্নি হাতে,
সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়্‌জে !

দাদুরি করে উলুধ্বনি, দেবতা নামে মর্ত্তে,
উশীর হ'ল সুরভি আজি ধূপেরি পরিবর্ত্তে !
স্তব্ধ চলা, বন্ধ খেয়া,
একাকী উঁকি দ্যায় গো কেয়া,
জ্বালায়ে মণি জাগিছে ফণী ত্যজিয়া নিজ গর্ত্তে।

দেবতা নামে! পুলকে হের দ্যুলোকে দোলে সিন্ধু!
রথের ধূলে মলিন হ'ল তপন তারা ইন্দু!
বাদল-বায়ে মন্ত্র পড়ি'
বাজায় কেও সাঁঝের ঘড়ি?—
থাকিতে বেলা! বিধান বিধি মানেনা একবিন্দু!

অন্ধ-করা অন্ধকারে নাহিরে নাহি রন্ধ্র!
বিরামহারা অধীর ধারা পাগল পারা ছন্দ।
হাজার-তারা সেতারখানি
বলিছে কিও ডাগর বাণী!
তরল তারে উঠিছে ধ্বনি মেদুর মৃদু মন্দ!

দেবতা চুমে ধরার আঁখি অলক চুমে রুক্ষ!
এলায়ে পড়ে বাদল্-মালা—রূপালি জরি সূক্ষ্ম!
চুমিয়া তনু কুসুমি' তোলে,
হরষ-দোলে পরাণ দোলে!
সেচন করে সফল করে মোচন করে দুঃখ।

দাঁড়াগো তোরা রাখীর ডোরা বাঁধিয়া নে গো ত্রস্তে;
দেবতা আসি' আশীষ-ধারা বরিষে আজি মস্তে!
দেখিস্ নে কি নীলাম্বরে
এসেছে করী-কুম্ভ-'পরে,—
আয়ত চোখে বিজুলি লেখা, উশীর মাথা হস্তে!

নূতন মানুষ

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দুনিয়াতে আজ নূতন মানুষ !—ভুলিয়ে নে রে ভুলিয়ে নে !
দুয়ার 'পরে আমের মুকুল,—
ঝুলিয়ে দে রে অশোক-বকুল,
দেব্‌তা আসে শিশুর বেশে, হায় রে স্নেহের দান সেধে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
নূতন আঁখির সোনার পাতায় সোহাগ-কাজল বুলিয়ে দে !
নূতন আওয়াজ কান্না কাঁদে !
নূতন আঙুল আঙুল বাঁধে ;
নূতন অধর পীযূষ পিয়ে নূতন মায়ার ফাঁদ ফেঁদে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
নরম আঁচে সদ্য-দুধের ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে !
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক
এসেছে ঐ ঐন্দ্রজালিক !
অরাজকের আপ্‌নি-রাজা, রাখ্‌বে হৃদয়-মন বেঁধে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দোল্‌না ঘিরে কাঁকণ কারা বাজায় চামর ঢুলিয়ে রে !
মরণ-বাঁচন-মেলার মাঝে
ওই রে শুভ শঙ্খ বাজে,
পুরাণো দীপ চায় গো হেসে, নূতন মানুষ চায় কেঁদে !

প্রথম হাসি

দোলার ঘরে শুনছি গো আজ নূতন, হাসির ধ্বনি !
ফুলঝুরিতে ফুল্‌কি হাসির রাশি !
রূপার ঘুঙুর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী !
কাঁদুনে ওই শিখ্‌লে কোথায় হাসি !

পিচ্‌কারীতে হান্‌লে কেরে গোলাপ-জলের ধারা ?—
ঝারার পাখী কয় কি হাসির কথা ?
বরফ-গলা ঝর্ণা যেন জাগ্‌ল পাগল-পারা !—
স্বচ্ছ প্রাণে সরল চঞ্চলতা !

প্রথম হাসির পান সুপারি কে দিল ওর মুখে ?
হাসির কাজল কে পরালে চোখে ?
হাস্‌ছে খোকা ! হাস্‌ছে একা ! হাস্‌ছে অতুল সুখে !
এমন হাসি কে শিখালে ওকে ?

কলস্বরে হাস্‌ছে ! ওরে ! হাস্‌ছে আপন মনে !—
দেখন্‌-হাসি পরীর হাসি দেখে !
খুলেছে আজ হাসির কুলুপ কোন্‌ কুঠুরির কোণে,—
মাণিকে তাই আকাশ গেল ঢেকে !

আনন্দের এই পরম অন্ন—প্রথম অন্ন—হাসি
কোন্‌ দেবতা প্রসাদ দিল ওকে ?
কাঁদুনে আজ নূতন ক'রে জন্মেছে রে আসি'
জন্মেছে সে হরষ-হাসি-লোকে !

ভাদ্রশ্রী

টোপর পানায় ভরল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাক্‌ল যেন কুণ্ডগুলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগ্‌ছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁৎরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোল্‌না বেঁধে দুল্‌ছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে-গুঁড়ির কোলাকুলি ;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে

কল্‌কে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বল্‌ছে আলো খাস্‌গেলাসে,
অভ্র-চিকণ টিকলি জলের ঝল্‌মলিয়ে যায় বাতাসে ;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন্ হাতে কে ওই মাঠে ?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে ;
ক'নের মুখে মনের সুখে উঠ্‌ছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠ্‌ছে বেজে আশার বাঁশী !

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে ?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজ্‌লী হ'ল বেঙাপিতল,
কেয়া ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পূবে বাতাস বইছে শীতল

"ওগো"

কিচ্ছু ব'লে ডাকিনেকো তারে,—
ডাক্‌তে হ'লে বলি কেবল 'ওগো !'
ডাকি তারে হাজারো দরকারে
জীবন-রণে সেই জেনারল টোগো !
সন্ধি এবং বিগ্রহেরি মাঝে
মুহুর্ম্মুহু চাই তারে সব কাজে ;
ডাক্‌তে কিন্তু বাধছে সম্বোধনে,—
ডাক্‌তে গিয়ে এগিয়ে দেখি—'No Go'
লজ্জা কেমন জোগায় এসে মনে
তাইতো তারে ডাকি সেরেফ 'ওগো !'

ছলে ছুতায় ডাক্‌ছি সকাল থেকে
'চাবিটা কই ? 'কাগজগুলো ? ওগো !'
'পানের ডিবে ?—কোথায় গেলে রেখে ?'—
হাঁক ডাকেতে ডাকাত আমি রোঘো।
টান্‌তে সদাই চাই গো তারে প্রাণে
শব্দ খুঁজে পাইনে অভিধানে,—
ভাষার পুঁজি শূন্য একেবারে,—
টাকশালে তার হয় না নূতন যোগও ;
মন-গড়া নাম চাইরে দিতে তারে,
শেষ-বরাবর কিন্তু বলি 'ওগো !'

বল্‌ব ভাবি 'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী'
ছেড়ে দিয়ে 'শুন্‌ছ ?' 'ওগো !' 'হাঁগো' ;
বল্‌তে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো ।—
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী
যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি,
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো ;—
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো ।

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো'
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue ও
ফুল-শেযে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো !'
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো !'
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে একচোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো' ।

কাশ ফুল

হোথা বরষার ঘন-যবনিকা খানি
সহসা গিয়েছে খুলি',
হেথা ঘাসের সায়র ফেনিল করেছে
কাশের মুকুলগুলি

ওই তূলি সমতুল শাদা কাশ ফুল
আলো ক'রে আছে ধূলি,
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে
ধরণী ধরেছে তূলি

যেন রাতারাতি সুধা-ধবলিত
করি' দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই গোপনে স্বপনে তূলি লাখে লাখ
সহসা উঠেছে জেগে

তারা কিছু রাখিবে না পাংশু ধূসর
কিছু রাখিবে না রুখু,
তারা আকাশের চাঁদে বুলাইতে চায়
আপনার রং টুকু !

তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার
শ্বেত-তূলি অঙ্গুলি,
ওগো জোছনায় রং ফলাইতে চায়
কাশের ক্ষুদ্র তূলি !

জোনাকী

ওই   একটি দু'টি পাতার পরে
একটু মৃদু আলো,
ও যে   দেখ্‌তে ভারি নূতন, ওরে—
কেমন লাগে ভালো।
আয় জোনাকী বুকটি ভ'রে
একটু নিয়ে আলো,
আজ   আঁধার রাতি বাদল সাথী
চাঁদের ভাতি কালো।
যেটুকু তোর দেবার আছে
দিয়ে দে তুই আজ,
ও সে   তারার মত নাই বা হ'ল,—
তাতেই বা কি লাজ ?
ছোট ?—সে তো ভালই আরো
ছোট বলেই মান ;
ও যে   দুঃখীজনের ভিক্ষা মুঠি,—
দানের সেরা দান !
থাক্ না তারা তপন শশী
থাক্ না যত আলো,—
তাদের মোরা করব পূজা,
বাস্‌ব তোরেই ভালো।

ফুল-সাজি

মনে যে সব ইচ্ছা আছে
পূরবে না সে তোমায় দিয়ে,
তাইতে প্রিয়ে ! মন করেছি
আরেকটিবার করব বিয়ে।

হাস্‌ছ কিও ? ভাব্‌ছ মিছে ?
মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ;—
মন যা' বলে শুন্‌তে হবে,—
মনের নাম যে মহাশয়।

মন বলেছে 'বিয়ে কর'
কাজেই হবে করতে বিয়ে।—
এবার কিন্তু ফুলের সঙ্গে,—
চল্‌ছে না আর মানুষ নিয়ে।

মনের কথা মনই জানে ;
লুকিয়ে কি ফল তোমার কাছে ?
মন সে বড় কেও-কেটা নয়
মনের নিজের মর্জ্জি আছে।

মন বলেছে বাস্‌লে ভাল
পুড়্‌তে হবে এক চিতাতে ;
মৃত্যু আমায় করলে দাবী—
মরতে তুমি পারবে সাথে ?

পারই যদি ;—তাতেই বা কি ?
আইন তোমায় বাঁধ্‌বে, প্রিয়ে !
কাজেই দেখ,—যা' বলেছি
চল্‌বে নাকো তোমায় দিয়ে।

এবার বিয়ে ফুলের কুলে,
জ্যোৎস্না-ধারায় অঙ্গ ধুয়ে,
হ'ক সে চাঁপা কিম্বা গোলাপ
আপত্তি নেই বকুল জুঁয়ে।
আন্‌ব ঘরে কিশোর কুঁড়ি
মনের গোপন পাঁজী দেখে,
বাঁদীর মত আন্‌ব বেছে
বনের বান্দা-বাজার থেকে।

সোহাগ দিয়ে রাখ্‌ব ঘিরে,
ঢাক্‌ব কভু প্রাণের নীড়ে,
ইচ্ছা হ'লে তুল্‌ব শিরে,
ইচ্ছা হ'লে ফেল্‌ব ছিঁড়ে।

মর্জ্জি হ'লে হাজারটিকে
পরব গলায় গেঁথে মালা,
ঝগড়াঝাটির নেইক শঙ্কা
সতীন-কাঁটার নেইক জ্বালা।

নেইক দ্বন্দ্ব দু'ইচ্ছাতে,—
নেইক লোকের নিন্দাভয়।
—হাস্‌ছ ? হাস। কিন্তু প্রিয়ে
করব বিয়ে সুনিশ্চয়।

ফুল-সাঞ্জি

ফুল-সাঞ্জি যে ফকির আছে
ফুলকে তারা ভালবাসে,
তাদের ধারা ধরব এবার,—
থাক্‌ব মগন ফুলের বাসে।

থাক্‌ব ডুবে অগাধ রূপে
কুরূপ কাঁটা দেখ্‌ব নাকো ;
ফুল নিয়ে ঘর করব এবার
তোমরা সবাই সুখে থাকো।

তার পরে দিন আস্‌বে যখন
মরতে আমি পারব সুখে,
ইতস্ততঃ করবে না ফুল
থাক্‌তে একা শবের বুকে।

ফুল—সে আমার সঙ্গে যাবে—
পুড়ব মোরা এক চিতাতে ;
দেখিস্‌ তোরা দেখিস্‌ সবাই
যেতে সে ঠিক্‌ পারবে সাথে।

ভেবেছিলাম প্রথম প্রিয়ে !
তোমায় এসব বল্‌ব নাকো,
লুকিয়ে ক'রে আস্‌ব বিয়ে
লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও।

কিন্তু ছাপা রইল না, হায় ;
মনের কথা—গোপন অতি—
বেরিয়ে গেল কথায় কথায়,—
কথায় বলে মন-না-মতি !

মনের ভিতর মর্জ্জি আছেন
নবাবী তাঁর অনেক রকম,
মনের কথা বল্‌লে খুলে
টিট্‌কারী সে করবে জখম।

লুপ্ত যুগের অস্থিগুলো
গুপ্ত আছে মনের ভিতে,—
সভ্যতার এই সৌধতলেই,—
বর্ত্তমান এই শতাব্দীতে!

তাই মগজের পোড়া কোঠোয়
অন্ধকারে ঘুরছে চাবী,—
বস্‌ছে উঠে গঙ্গাযাত্রী;—
সহমরণ করছি দাবী!

বাঁচন এই যে সম্প্রতি মন
মগন আছে ফুলের রূপে,—
নইলে কিযে ঘট্‌ত বিপদ!—
বল্‌ব তাহা তোমায় চুপে?—

মরণ-দায়ে গেছ বেঁচে;
পালাও প্রিয়ে প্রাণটা নিয়ে;
ফুল-সাঞ্জিদের মতন আমি
ফুলকে এবার করব বিয়ে!

জবা

আমারে লইয়া খুসী হও তুমি
ওগো দেবী শবাসনা !
আর খুঁজিয়োনা মানব-শোণিত
আর তুমি খুঁজিয়োনা।

আর মানুষের হৃৎ-পিণ্ডটা
নিয়োনা খড়্গে ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুলোনা গো আর
সুখের নিভৃত নীড়ে।

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া
উজলি' পুষ্প-সভা,—
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ড গো !—
আমি সে রক্তজবা।

তোমার চরণে নিবেদিত আমি
আমি সে তোমার বলি,
দৃষ্টি-ভোগের রাঙা খর্পরে
রক্ত-কলিজা কলি।

আমারে লইয়া খুসী হও ওগো !
নম দেবী নম নম,
ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ
ধরার শিশুরে ক্ষম।

সৎকারান্তে

রেখে এলাম একলা-যাবার পথের মোড়ে ;
সেই কথাটি জানাই প্রভু ! করজোড়ে !
নেহাৎ শিশু নয় সেয়ানা,
অচেনা তার ষোল আনা,—
ভয় যদি পায় নিয়ো তুলে অভয় ক্রোড়ে,
প্রভু আমার ! একলা-চলা পথের মোড়ে।

তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে—নির্ভাবনা ;
নইলে প্রভু ! সইত কভু যম-যাতনা ?
যম—নিয়মের ভৃত্য তোমার,—
চিতার শিখা অঙ্গুলি তার,—
সেই আঙুলে নেয় সে চুনি' রত্ন-কণা ;
তোমার হাতে সঁপে সে হয় নির্ভাবনা !

সঁপে গেলাম প্রভু ! তোমার চরণ-ছায়ে,—
মুক্ত হ'লাম তোমার দয়ায় সকল দায়ে ;
ফিরিয়ে তোমার গচ্ছিত ধন
হাল্কা হ'য়ে গেল জীবন,
মায়ের বুকের রত্ন দিলাম বিশ্ব-মায়ে,
ওগো প্রভু ! সঁপে গেলাম তোমার পায়ে !

রেখে গেলাম তুমি-দোসর পথের মোড়ে,
সেই কথাটি জানাই তোমায় করজোড়ে ;
জানি তুমি নেবেই কোলে,
তবু তোমায় যাচ্ছি বলে,—
বিশ্বমায়ে বল্‌ছি,—অবোধ,—নিতে ওরে ;—
দাঁড়িয়ে তোমার যম-জাঙালের বক্র মোড়ে।

ছিন্ন মুকুল

সব চেয়ে যে ছোটো পীঁড়ি খানি
সেই খানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্টো গেলাসেতে ;
বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সব চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী,—
খুসী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে ;
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয়-তরাসে ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবী !

চলে গেছে একলা চুপে চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে ;
যাবার বেলা টের পেলে না কেহ
পারলে না কেউ রাখ্‌তে তারে ধ'রে।
চ'লে গেল,—পড়তে চোখের পাতা,—
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না শুনে বুঝি !
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি,
ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী।

সব চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি
সে গুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজ্‌কে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে;
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে।

অভয়

মেঘ দেখে কেউ করিস্ নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য্য হাসে!
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে!
দখিন হাওয়ার অমোঘ বরে
রিক্ত শাখাই পুষ্পে ভরে,
সিক্ত যে প্রাণ অশ্রুধারায়
প্রাণের প্রিয় তারি পাশে!

ভুঁই চাঁপা

দিনের আলোয় লাগ্‌ল রে নীল তন্দ্রা-লেখা !
নিবিড় সুখে কী কৌতুকে বাজ্‌ল কেকা !
রসিয়ে রবি-রশ্মি হোথা
পূবে হাওয়ার বইল সোঁতা,—
আজ পাতাল-ঘরের নাগিনী ওই বাইরে একা !

কৌতূহলী কেকাধ্বনি মূর্ত্তি ধরে !—
ফুট্‌ল সে ভুঁই চাঁপা হ'য়ে মাটির 'পরে !
বিস্ময়েরি বোল্ বেজেছে,—
বিনা-ডালেই ফুল সেজেছে !—
ওই লুপ্ত গাছের গোপন মূলে কী মন্তরে।

শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি,
মাটির কোলে পাপ্‌ড়ি মেলে ভুঁই চাঁপাটি !
মগন ছিল পাতাল-তলে
জাগ্‌ল সে আজ কিসের ছলে ?—
বুঝি ঠেক্‌ল মাথায় বৃষ্টিধারার রূপার কাঠি !

বেরিয়েছে তাই পাতাল-পুরীর রত্ন-কণা !—
লক্ষ-ফণা অনন্তেরি একটি ফণা !
আন্ জনমের নষ্ট মুকুল,—
এই দিনের এই ফুটন্ত ফুল,—
ওগো যুক্ত সে কোন্ গোপন সুতায়—অদর্শনা !

দিনের আলোয় লাগ্‌ছে আজি তন্দ্রা চোখে,
নিবিড় নীলে ডুবিয়ে নিল স্বপ্নলোকে !
পাতাল-পুরীর কুণ্ড হ'তে
অমৃত কে বহায় স্রোতে !—
ওগো জন্ম-মরণ যুক্ত ক'রে ফুট্‌ল ও কে !

আজ্‌কে খালি ফিরে-পাওয়ার বইছে হাওয়া!
নেই কিছু নেই চিরতরেই হারিয়ে-যাওয়া!
হারাণো ফুল ফুট্‌ছে ফিরে
শাঁওল মাটির আঁচল ঘিরে!
ওই মূলের ঘরে মিল্‌ যে আছেই—যাবেই পাওয়া!

ছিন্ন ছায়া ঘনিয়ে এল
ঘুমে নয়ন আলা,
ঘুমাক্‌ আহা ঘুমাক্‌ তবে
বালা।
হাওয়ার ভরে যায় পরীরা,
ঢেউয়ের ফণায় নিব্‌ল হীরা,
জড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে
নিদ্‌কুসুমের মালা!
ঘুমাক্‌ আহা ঘুমাক্‌ তবে
বালা।
তোলে নি আজ বৈকালী ফুল,—
ভরে নি আজ থালা,
ছায়ায় ছাওয়া রূপের রসের
ডালা;
গন্ধ তৃণের গহন শ্বাসে
শিউলি কুঁড়ি ঝিমিয়ে আসে,
তন্দ্রা-ভারে পড়ল ভেরে
আঁধারে ডাল-পালা!
ঘুমাক্‌ আহা ঘুমাক্‌ তবে
বালা।

শিয়রে থোও সোনার কাঠি
সন্ধ্যা-মেঘে ঢালা,
খণ্ড চাঁদের দীপখানি হোক্
জ্বালা ;
হাওয়ার মুখে নাই কোনো বোল্,—
অশথ পাতায় দেয় না সে দোল,
আঁধার শুধু কোল ভরেছে,—
হিমে শীতল—কালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা !
শুন্‌বে না সে আজ ঝিঁঝিদের
রাত্রি ব্যাপী পালা,
দেখ্‌বে না গো বনে জোনাক্-
জ্বালা ;
পর্দ্দাখানি দাও গো টানি'
ঘুমিয়ে গেছে আলোর রাণী,
লুপ্ত-শিখা সোনার প্রদীপ
মৃত্যু-ভুবন আলা ;—
ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে
বালা।

গঙ্গার প্রতি

সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্যাম-শস্য-হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি
অয়ি সুরধুনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আশীর্ব্বাদ !
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর প্রসাদ !

রিক্ত ছিল মহী, তারে তব বর করিল উর্ব্বর,
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীর্ত্তি তোর গাহে নিরন্তর,
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি' বেদ-মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা ! সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি মাতা !

তোরে ঘিরি' উর্ব্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি' চিতানল উদ্ধারের শ্বসিছে কামনা ;—
তীরে তীরে প্রেতভূমে ; অয়ি রুদ্র-জটা-নিবাসিনী !
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিব-নাশিনী ।

অমল পরশ তোর বড় স্নিগ্ধ মাগো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্ত ভালে বুলাও গো অমৃত-হিল্লোল ।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে সঁপি পুত্রকন্যা, তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে

একদিন তারা সবে ; দেহভার বহে প্রতীক্ষায় ;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,—
ভস্ম মিলে ভস্ম সনে,—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার !
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার ।

পর্ব্ব রচি' তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারম্বার,
পরশি তোমারে—অয়ি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গা ভাগীরথী ! ভারতের অন্ত, মধ্য, আদি !

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি চাহিনু,—স্বর্গ-সুষমা মর্ত্ত্যে পড়েছে খসি' !
এ পারে সবুজ বজ্‌ড়ার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক-আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল !
আধ চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে ।
জয় জয় বারাণসী !
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী ।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে ;
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যার রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বারবার
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার ।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি' !
এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
—কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ম্বর ।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইল আপনায় ।

তেজের মূর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয় ;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।
শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতসুখ !
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায় !
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি !
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয় ! জয় ! জয় কাশী !
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতি রাশি !
এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুঁহুঁ হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব !
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব ;

আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলন-ধর্ম্মী মানুষ মিলিবে ; এ নহে স্বপ্নকথা।
জয় কাশী ! জয় ! জয় !
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হ'বে তুমি নিশ্চয়।

স্ফটিক শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরভূমি ;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে ;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসী !
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি' ?
মধু-বিত্যায় বিশ্বমানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হোক্ সকল মানব, জয়ী হোক্ ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কর্ম্মনাশা।
ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হ'বেনাকো একেবারে
সবারেই দিতে হ'বে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি অশুচির ভেদ ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর ব্যাপী চির জনমের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী ভূমি !
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ ;
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায় ? কেবলি পুষিবে দেহ ?
দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চির-নিবৃত্ত হোক্,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।

অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো;
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক পাশাপাশি মিলেজুলে;
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

ধূলী

জীবনের লীলাক্ষেত্র পুণ্য ধরাতল,
প্রতি ধূলিকণা তার পবিত্র নির্ম্মল।
মানবের হর্ষ, ব্যথা, মানবের প্রীতি,
মানবের আশা, ভয়, সাধনার স্মৃতি,—
স্পন্দিত করিছে তার প্রত্যেক অণুরে
নিত্য নিশিদিনমান; অবিশ্রাম সুরে
উঠিছে গুঞ্জন গান অশ্রুত-মধুর—
অতীতের প্রতিধ্বনি বিস্মৃত সুদূর!
এই যে পথের ধূলি উড়ায় বাতাস
মহামানবের ইহা মৌন ইতিহাস;
তীর্থময় মর্ত্ত্যলোক; প্রতি রেণু তার
আনন্দ-গদ্গদ চির অশ্রু-পারাবার।

হিমালয়াষ্টক

নম নম হিমালয় !
গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয় !
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর !
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর !
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয়।
নম নম হিমালয় !

নম নম গিরিরাজ !
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার ;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ !
নম নম গিরিরাজ !

নম মহামহীয়ান্ !
নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি',
ভীম অর্ব্বুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয় গান !
নম মহামহীয়ান্ !

নম নম গিরিবর !
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর।
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।
নম নম গিরিবর।

৬

নম নম হিমবান্ !
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান ;
নম নম হিমবান্ ।

নম নম ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী', তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির-অমরতা-বর !
নম নম ধরাধর ।

নম নম হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল !
নম নম হিমাচল ।

অতীত-সাক্ষী নম !
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত নম ।

কাঞ্চন শৃঙ্গ

কোথা গো সপ্ত-ঋষি কোথা আজ ?—
কোথায় অরুন্ধতী ?
শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম,
এস গো তুলিবে যদি !
প্রত্যুষে সে যে ফুটিয়া, প্রদোষে
নিঃশেষে লয় পায়,
সোনার কাহিনী স্মরিতে একটি
পাপ্‌ড়ি না রহে, হায় !
কে জানে কখন অপ্সরাগণ
সে ফুল চয়ন করে,
সোনালি স্বপন লেগে যায় শুধু
নরের নয়ন 'পরে !

নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার
ওগো কাঞ্চন-গিরি !
দেব-হস্তের কুঙ্কুম ঝরে
নিত্য তোমার ঘিরি' !
সোনার অতসী সোনার কমলে
নিত্যই ফুল-দোল !
নিত্যই রাস জ্যোৎস্না-বিলাস !
হরষের হিল্লোল !
নিত্য আবার বিভূতি তোমার
ঝরে গো জটিল শিরে,
কন্‌কনে হিম তুষার-প্রপাত
সর্পের মত ফিরে !

দিনে তুমি যেন মূর্ত্ত জীবন
রজত-শুভ্র-কায়া,
নিশীথে তুমিই ভীষণ পাংশু
মহামরণের ছায়া ;—
আঁধারের পটে যখন তোমার
পাণ্ডু ললাট জাগে,—
ভয়-বিস্ফার নয়নে যখন
তারাগণ চেয়ে থাকে !

তুমি উন্নত দেবতার মত,
উদ্ধত তুমি নহ,
নিগূঢ় নীলের নির্ম্মলতায়
বিরাজিছ অহরহ।
দৃষ্টি আমার ধৌত করিছে
রুচির তুষার তব,
হৃদয় ভরিছে হরষ-জোয়ার
বিস্ময় নব নব !
এ কি গো ভক্তি ?—বুঝিতে পারি না ;
ভয় এ তো নয় নয়,
সকল-পরাণ-উথলানো এ যে
সনাতন পরিচয় !
তোমার আড়ালে বাস করি মোরা
তোমার ছায়ায় থাকি,
তোমাতে করেছে স্বর্গ রচনা
মুগ্ধ মোদের আঁখি ;

ভূলোকের হ'য়ে দ্যুলোক কেড়েছ
স্বর্লোক আছ তুমি',
অমর-ধামের যাত্রার পথে
দিব্য-শিবির তুমি !

নম নম নম কাঞ্চন-গিরি !
তোমারে নমস্কার,
তুমি জানাতেছ অমৃতের স্বাদ
অবনীতে অনিবার !
তোমার চরণে বসিয়া আজিকে
তোমারি আশীর্ব্বাদে
সোনার কমল চয়ন করেছি
সপ্ত ঋষির সাথে।

মাটি

এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির-চমৎকার,—
চরণে লীন এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার,—
এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণ-গুল্মময়,—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয়।

মাটি তো নয়—জীবন-কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,—
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার !
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—একপিঠে তার লীলার খেল,
আরেকটি দিক অন্ধ-অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল !

মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয়-লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয় !
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সুতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই !

মেঘলোকে

গিরি-গৃহে আজ প্রথম জাগিয়া
আহা কি দেখিনু চোখে,
মর্ত্ত্যলোকের মানুষ এসেছি
জীবন্তে মেঘলোকে!
গিরির পিছনে গিরি উঁকি মারে
চূড়ায় লঙ্ঘে চূড়া,
বিন্ধ্যের মত কত পাহাড়ের
গর্ব্ব করিয়া গুঁড়া!
তারি মাঝে মাঝে এ কি গো বিরাজে?-
এ কি ছবি অদ্ভুত!—
গিরি-উপাধান সানুতে শয়ান
কোন্ যক্ষের দূত?
চারি দিকে তার তল্পি যত সে
ছড়ানো ইতস্তত,
পাশ মোড়া দিয়া ঘুমায় রৌদ্রে
ক্লান্ত জনের মত!
কে জানে কাহার কি বারতা লয়ে
চলেছে কাহার কাছে,
বসনের কোণে না জানি গোপনে
কার চিঠিখানি আছে!
সে কি যাবে আজ অলকাপুরীতে
ক্রৌঞ্চদুয়ার পথে?—
তুষার ঘটার জটিল জটায়
লঙ্ঘিয়া কোনো মতে?

কূপ, নদী, নদ, সমুদ্র, হ্রদ—
যার যাহা দেয় আছে,—
সব রাজস্ব সংগ্রহ ক'রে,
পবনের পাছে পাছে—
সে কি আসিয়াছে গিরিরাজ-পদে
করিতে সমর্পণ ?
কিবা, তার শুধু কুটজ ফুলের
জীবন বাঁচানো পণ !

রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া
উঠিল মেঘের দল,
শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া
চলিয়াছে টলমল ;
দেখিতে দেখিতে বিশা'য়ের
এই পাষাণ-যজ্ঞশালে
শত বরণের সহস্র মেঘ
জুটিল অচির কালে !
চমরী-পুচ্ছ কটিতে কাহারো
ময়ূর-পুচ্ছ শিরে,
ধূমল বসন পরিয়া কেহ বা
দাঁড়াইল সভা ঘিরে !
সহসা কুহেলি পড়িল টুটিয়া,
অমনি সে গরীয়ান্
উদিল বিপুল হৈম মুকুটে
গিরিরাজ হিমবান !

গগন-গরাসী প্রলয়ের ঢেউ,—
আদি প্লাবনের স্মৃতি,—
প্রাচীন দিনের পাগল ছন্দ,—
উদ্বেল মহাগীতি,—
মহান্ মনের উচ্ছ্বাস যেন
সফল হ'য়েছে কাজে,—
আদি কল্পনা রেখেছে নিশানা
সৃষ্টি-পুঁথির মাঝে !
নীল আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা
যেন গো সবলে চিরি'
ধরার পরশ ঠেলিয়া, গগন—
ফুঁড়িয়া উঠিছে গিরি !
একি মহিমার মহান্ বিকাশ !—
আকাশের পটে আঁকা,
দ্যুলোকে দুলিছে স্বর্গের জ্যোতি
স্বর্গের স্মৃতি মাখা !
নিখিল ধরার ঊর্দ্ধে বসিয়া
শাসিছে পালিছে দেশ,
বজ্র টুটিছে, বিজুলী ছুটিছে,
নাহি ভ্রূক্ষেপ-লেশ !

* * *

আজি দলে দলে গিরিসভাতলে
মেঘ জুটিয়াছে যত,
প্রমথ-নাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে
প্রমথ-দলের মত !

নীরবে চলেছে গিরি প্রধানের
সভার কর্ম্মচয়,
সৃজন, পালন—বহু আয়োজন
ওই সভাতলে হয় ;
কোন্ ক্ষেতে কত বরষণ হবে,—
কোন্ মেঘ যাবে কোথা,—
সকলের আগে হয় প্রচারিত
ওইখানে সে বারতা ;
শিখরে শিখরে তুষার-মুকুরে
ঠিকরে কিরণ-জ্বালা,
মুহূর্ত্তে যায় দেশদেশান্তে
গিরির নিদেশ মালা !

বার্ত্তা বহিয়া শূন্যের পথে
মেঘ ওঠে একে একে,
রৌদ্র ছায়ার চিত্র বসনে
নানা গিরি বন ঢেকে ;
আমি চেয়ে থাকি অবাক নয়নে
বসি' পাথরের স্তূপে,
সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন
পশেছি একেলা চুপে !
হাজার নদের বন্যা-স্রোতের
নিরিখ্ যেখানে রয়,—
লক্ষ লোকের দুঃখ সুখের
হয় যেথা নির্ণয়,—
মেঘেরা যেখানে দূর হ'তে শুধু
বৃষ্টি মারে না ছুঁড়ে,—

পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,—
পʼড়ে থাকে সানু জুড়ে ;—
কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গী করিয়া
কীর্ত্তনিয়ার মত,—
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি,
কেহ নর্ত্তনে রত !
কখনো আবার মেঘের বাহিনী
ধরে গো যোদ্ধৃ বেশ,—
মৃত্যুতে যেন মর্ত্ত্য-প্রেতের
কলহ হয়নি শেষ !
কৌতুকে মিহি চাঁদের সুতার
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ !
আমি বসে আছি এ সবার মাঝে
এই দূর মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার
নিরখি চর্ম্ম-চোখে !
স্বর্গের ছায়া মর্ত্ত্যে পড়েছে,
শান্ত হʼয়েছে মন,
নয়নে লেগেছে ধ্যানের সুষমা—
দেবতার অঞ্জন ;
চক্ষে দেখেছি দেবতার দেশ
দূরে গেছে গ্লানি যত,
মেঘেরও ঊর্দ্ধে করেছি ভ্রমণ
গ্রহ-তারকার মত !

দার্জ্জিলিঙের চিঠি

বন্ধু,

আমি এখন বসে আছি সাত-শো-তলার ঘরে !
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।
ফিরোজা রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্‌না ঝেড়ে যায় !
অস্ত রবির আভাস লাগে পূর্ণিমা চাঁদে,
শীর্ণ ঝোরা যক্ষ-নারীর দুঃখেতে কাঁদে !
তবু এখন নাই অলকা নাই সে যক্ষ আর,
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবির কল্পনার।

* *

হঠাৎ এল কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া !
কুহেলিকার কুহকে হায় সৃষ্টি ডুবিল,
ঝাপ্‌সা হ'ল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি !
সকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আরাম পরাণে !

* *

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়,
গুল্ম-ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায় ;

নীল আলোকের আব্ছায়াতে নিলীন তরুচয়,
'কাঞ্চি'-মণির দুল্ দুলিয়ে হাল্কা হাওয়া বয়!
মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ-ভরা নীল,—
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল ;
শান্তি হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাখীর আছে কি বাসা ?

* *

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্ত রবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে !
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচ্কারী হানে,
রামধনুকের রঙীন্ মায়া ছড়ায় বিমানে ;
মেঘে মেঘে পান্না চুনীর লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষার গিরি উদ্যত জাগে !
দিব্য-লোকের যবনিকা গেল কি টুটি' ?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি' ?

* *

গিরিরাজের গায়ত্রী-টোপর ওই গো দেখা যায়,—
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ-সুষমায় !
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে লাখ,
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্ব্বাক্ !
নর-চরণ-চিহ্ন কভু পড়ে নি হোথায়,
নাইক শব্দ, বিরাট, স্তব্ধ—আপন মহিমায় !
সন্ধ্যা প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
রুদ্ধগতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায় !
শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় রঙীন মহোৎসব,
বিদূর-ভূমে রত্ন-ফসল হয় বুঝি সম্ভব !

মর্ত্ত্যে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার।

* *

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য্য, তারা, মুখ দেখে সবাই !
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াসার,
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা যমুনার !
ওইখানেতে তুষার-নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখার ঘাত-প্রতিঘাত চল্‌ছে অবিরল।
উচ্চ হতে উচ্চ ওযে মহামহত্তর,
নির্ম্মলতার ওই নিকেতন অক্ষয়-ভাস্বর !

* *

হয় তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
হয় তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর ;
রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মূরছায় !
হয় তো আদিবুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি' কিরণ সাজে !
কিম্বা হোথা আছে প্রাচীন মানস সরোবর,—
স্বচ্ছশীতল আনন্দ যার তরঙ্গ নিকর !
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদুহাস !

* *

লামার মুলক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াসায় ?
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায় !
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়।

এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ কলরব !
এম্‌নি ক'রে স্বর্ণ শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময় ।
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনাহারা ?
চোখে পলক নাইক তাঁদের—পড়ে না ছায়া,—
মমতা কি যায়নি তবু—ঘোচেনি মায়া ?
তাই বুঝি হায় ফিরে যেতে ফিরে ফিরে চাই,
কে যেন, হায়, রইল পিছে,—কাহারে হারাই !

সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙীন চরাচর,
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতঃপর ।
উঠ্‌ল সেজে সাঁঝের আলোয় দার্জ্জিলিং পাহাড়,
ফুট্‌ল যেন ভুবন-জোড়া গাঁদাফুলের ঝাড় !
কুজ্ঝটিকায় সাঁঝের আঁধার হ'ল দ্বিগুণ কালো,
অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো ।
তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি,
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি ।
ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র-মোহ অম্‌নি তখন খসে,
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে ঘিরে বসে ।
ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই,
ইচ্ছা করে কৃচ্ছ্র-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই ;
শিক্ষা-শাসন হেথা ; সেথায় হরষ হিন্দোল,
এযে কঠোর গুরু-গৃহ সে যে মায়ের কোল ।

তাই নিশীথে ঘরের কথা জাগে সে সদাই,
মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।
সংগোপনে শব্দ যোজন করি দু' চারিটি,
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্ন স্বাস্থ্য কর্ত্তে আস্ত পড়্ছে ভেঙে মন,
ডাক পিয়নের মূর্ত্তি ধেয়ান ক'রে সকল ক্ষণ,
তাই অনুরোধ মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার ক'রে নাও, ভাই!

চূড়ামণি

ডুবেছে সকলি, তবু, শীর্ষ জেগে আছে,
জেগে আছে হিমালয়; সে তো কারো কাছে
কোনদিন ভ্রমেও হয়নি অবনত!
শক, হূণ, মোগল, পাঠান কতশত
আসিয়াছে মুক্তরোধ বন্যা সম, তবু
পারেনি ডুবাতে কেহ কোনোমতে কভু
মহিমা-মণ্ডিত পুণ্য হিমালয় চূড়ে!
কোলাহল ক'রেছে কেবল ফিরে ঘুরে।
পরাজয় স্বীকার করেনি হিমালয়।
তুষার-উষ্ণীষ তব কলঙ্কিত নয়
চরণধূলায় কারো, ওগো পুণ্যভূমি!
সকল গ্লানির ঊর্দ্ধে বিরাজিছ তুমি,—
লয়ে তব ব্রহ্মবিদ্যা, তপস্যার বল;
জগতের চূড়ামণি অটল অচল!

সিংহল

("young Lochinvar"এর ছন্দে)

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ !
যার উত্তাল-তাল কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস !
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায় ;
এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজো বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়।

ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ্‌ শঙ্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর,
হায় লুব্ধের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্যার হয় বর।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্ম্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্ব্বাণ।

(Un Pelerin D' Angkar পড়িয়া)

ওঙ্কার ধাম! ওঙ্কার ধাম!
চিত্ত-চমৎকার!
শ্যাম-কাম্বোজে কনকাম্ভোজ
হিন্দুর প্রতিভার!
তোরণে তাহার সপ্তশীর্ষ
সর্প সে ফণা ধরে,
পর্ব্বত সম বিপুল দেউল
মিশরের যশ হরে।
যোজন ব্যাপিয়া পত্তন তার,
বিঁধিয়া নীলাম্বর
পর্ব্বতজয়ী গর্ব্বে উঠেছে
দেউল স্তরে স্তর!
গুম্বজে তার সোনার পদ্ম,
চূড়ায় চতুর্ম্মুখ—
নীরব হাস্যে নিরখে চতুর্
দিকের দুঃখ সুখ;—
বিরাট মূরতি, আরতি তাহার
জাগায় ভকতি ভয়!
দেউল ঘিরিয়া মূর্ত্তি-মেখলা,—
রামায়ণ শিলাময়!
রাক্ষস, রথ, হস্তী মহৎ,
যুদ্ধের হুড়াহুড়ি,
সাগর মথন, দেব অগণন,—
রয়েছে যোজন জুড়ি'!

প্রতি শিলা তার পেয়েছে আকার
শিল্পীর স্থপরশে,
সারি সারি সারি বুদ্ধ মূরতি
মগন ধ্যানের রসে।
বিম্ব হাজার একই দেবতার
রেখেছে গো খুদে খুদে,—
নির্ব্বাক্ শিলা নীরবে ঘোষিছে,—
দেবতা সর্ব্বভূতে !
শিল্পীর তপে হেথা অপ্সরা
রয়েছে পাথর হ'য়ে—
হেম-মুখী প্রেম মদিরেক্ষণা—
বহুর সোহাগ স'য়ে !
যোজন জুড়িয়া রয়েছে পাষাণ,
স্তম্ভের মহাবন,
জনপদ দশলক্ষ লোকের
নামশেষ সে এখন !
নিবিড় বনের সবুজ আঁধার
দিনে আছে দিক্ জুড়ে ;
শব-শিব একা বিরাজিছে আজ
চতুর্ম্মুখের চূড়ে !
আধেক ভগ্ন ধূলায় মগ্ন
আগুনে মূরতিগুলা,
নাই লোক শুধু বাদুর পেচক,—
পালক এবং ধূলা।
ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার ধাম !
নাই—কারো নাই সাড়া,

ঘণ্টার মালা দুলিছে কেবল
বাতাসে পাইয়া নাড়া।
ধ্বংসের দাড়া অশথ শিকড়
পাকড়ি' ধরিছে আঁটি' ;—
তার সাথে ধূলি আর বিস্মৃতি,
শিয়রে মরণ-কাঠি।
ওঙ্কারধাম! ওঙ্কার ধাম!
বিস্মৃত তুমি আজ,
জানে না হিন্দু কীর্ত্তি আপন!
হায় নিদারুণ লাজ!

শোণ নদের প্রতি

সৈকত-শয্যার 'পরে সুবিশাল বাহু যেন কার
সূচনা করিয়া শুভ স্ফুরিয়া উঠিছে বারম্বার
বলদৃপ্ত, কাঞ্চন-বরণ। হে হিরণ্য-বাহু নদ,—
কোন্ দেবতার তুমি বাহু? কত ঋদ্ধ জনপদ,—
কত গ্রাম, কত ক্ষেত্র—সম্পদে দিয়েছ তুমি ভরি' ;
দিয়েছ—দিতেছ আরো ; নাহি জানি কত কাল ধরি'।

প্রাচীন পাটলিপুত্র—পোষ্য প্রতিপাল্য সে তোমার,—
মৌর্য্যমণি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাণী অঙ্কে দিল যার,—
মৌর্য্যবংশ স্থাপয়িতা ; যে বংশের প্রতাপে মলিন
সূর্য্যবংশ।—ধর্ম্মাশোক যাহারে পালিল বহুদিন
জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা। ওগো শোণ! তোমারি শোণিতে
পুষ্ট সে গোবিন্দসিংহ ;—গুরু নামে খ্যাত অবনীতে।

ওগো শোণ!—স্বর্ণবাহু! অতীতের মুকুটের সোনা!
তোমার ও ঊর্ম্মিজাল—গৌরবের স্বর্ণ-জরি বোনা!

সিদ্ধিদাতা

(যবদ্বীপের একটি গণেশ মূর্ত্তির ছবি দেখিয়া)

একি তোমার মূর্ত্তি হেরি !—একি হেরি সিদ্ধিদাতা !
হাজার নর-মুণ্ড 'পরে ঠাকুর ! তব আসন পাতা !
হাজার জীবন নষ্ট হ'লে—ব্যর্থ গেলে হাজার জন—
তবে তোমার হয় প্রতিষ্ঠা ? নির্ম্মিত হয় সিংহাসন ?
তখন তুমি প্রসন্ন হও—তখনি হও আবির্ভাব ?—
নইলে পরে ব্যর্থ আশা ?—নইলে সুদূর সিদ্ধিলাভ ?

খুলে গেল দৃষ্টি এবার !—ঠাকুর ! তোমায় নমস্কার !
হাড়ের স্তূপে সিদ্ধিদাতার আসন-পাতা ! চমৎকার !

* * *

দুর্গমে কে যাত্রা ক'রে যবদ্বীপে করলে জয় !
কত বছর যুদ্ধ হ'ল কতই প্রাণের অপচয় !—
হিসাব তাহার নাইক কোথাও ; শিল্পী শুধু কল্পনাতে
আভাসখানি রেখে গেছে কঙ্কালের ওই অঙ্কপাতে ;
গড়ে গেছে পাথর কেটে মূর্ত্তিখানি জীবন্ত,
শবাসনে সিদ্ধিদাতা,—শোকের দহন নিবন্ত।
নৃমুণ্ডেরি স্তূপের পরে জাগ্‌ল বিপুল জয়ের গাথা,
অভেদ হ'য়ে দিলেন দেখা সিদ্ধি সনে সিদ্ধিদাতা !

* * *

খর্ব্ব তুমি—স্থূল রকমের, সিদ্ধি—তুমি লম্বোদর ;
তবু তোমায় চায় সকলে, তবু তুমিই মনোহর !
তোমার লাগি বিশ্বামিত্র পীড়া দিল নিখিল জীবে,
যাত্রী ছোটে তোমার লোভে মর্ত্ত্যলোকে আর ত্রিদিবে ;
কারো হঠাৎ নিব্‌ছে বাতি,—কারো মাথায় চক্র ঘোরে,
কেউ বা লভে জ্ঞানের ভাতি, কেউ বা পথেই যায় গো ম'রে !

সিদ্ধি লাগি' কর্ম্মী, জ্ঞানী ছুট্‌ছে কবি দিবস নিশা,
কেউ বা লভে স্বর্ণকণা, কেউ বা ধূলায় হারায় দিশা !

* * *

শিখাও প্রভু ! বিঘ্ন বিপদ ফেল্‌তে ঠেলে দুঃখ রাতে ;
করতে শিখাও কৃচ্ছ্রসাধন নাম লিখিয়ে খরচ-খাতে,
মরতে শিখাও শুষ্ক মুখে, ফিরতে শিখাও শূন্য হাতেই,
সত্যভানু প্রদীপ্ত যে নৃ-কপালের শুভ্রতাতেই ।

* * *

পশু পূজা ঠাকুর ! তোমার ক্ষুদ্রচেতা বেনের ঘরে,—
উঞ্ছলোভী মূষিকে সে সিদ্ধিদাতার বাহন করে !
তারা তোমায় চেনে না, হায়, চেনে নাক সিদ্ধিদাতা,
অভ্রভেদী নৃকঙ্কালে প্রভু ! তোমার আসন পাতা ।

ক্ষুদ্রের প্রার্থনা

ঠাঁই দাও সখা ! কুণ্ঠা-কাতর
শীতল-শিথিল কুন্দরে ;—
ব্যথা-বিমর্ষে তোমারি হর্ষে
তব নিরাময় সুন্দরে ।
লুকায়ে লও হে লাজ-লাঞ্ছিতে
অনাথ-শরণ ধূলিতে—
লজ্জা-হরণ তোমার চরণ-
কমলের রেণুগুলিতে !
কুহেলি আঁধার মরণের পারে
অমৃতে জুড়ায়ে দাও হে তাহারে ;
ক্ষুদ্র তরীটি লও হে ভিড়ায়ে
চির-নিরাপদ বন্দরে ।

প্রভাতের নিবেদন

প্রভাতে বিমল ক'রেছ যেমন
অমনি বিমল কর মন,
অমনি শান্ত শীতল, অমনি
হরষের রসে নিমগন।
বেদনার কিবা উদ্বেজনার
চিহ্ন না থাকে কোনো খানে আর,
ছেয়ে যায় যেন আলোয় পরাণ,
বয়ে যায় মৃদু সুপবন।

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরদৃপ্ত, চির-অব্যাহত।
দুর্নমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর!

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।
উর্ব্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছে দশদিক ভরি'!

অন্তহীন মূর্চ্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সঙ্গীতে,—
ঝঙ্কারিয়া রুদ্রবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে !
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর ;
দুর্ব্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্জেয়-সুদূর !

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্ব্বার ;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার !
স্বর্গ হ'তে অবতরি' ধেয়ে চলে' এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে !

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ ;
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী !
অনাহূত—অনার্য্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি !

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্য্যয় প্রলয়ের কাজে !
দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিন রাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন ; সিন্ধুসখী ! হে সাম্যবাদিনী !
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা ! কল্লোলনাদিনী !
ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটীরে ;

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই !
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অয়ি পদ্মা ! অয়ি বিপ্লাবিনী !

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো!
শূদ্রে দেখোনা বক্র চোখে।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য্য কেবা?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে।

পিপাসী

তোমারি চরণ-কমলের মধু-
পিপাসায় প্রাণ কাঁদে !
চিত্ত চকোর মত্ত হয়েছে
ছুঁইতে ছুটেছে চাঁদে !
স্বপন-বরষা নেমেছে সহসা
নীরবে ভুবনময় !—
ফুলগুলি কথা কয় !
বাতাস কোথায় নিয়ে যেতে চায়
উদাসীন উন্মাদে !
মরম বীণার ছিঁড়ে গেছে তার
তাই আছি ম্রিয়মাণ,
থেমে আছে তাই গান ;
তুমি তারে তারে দাও নব প্রাণ
জাগাও নূতন তান !
আঁখিজলে মোরে করি' নিরমল
ফোটাও তরুণ হাসি,-
শারদ শেফালি রাশি ;
দুঃখের ধূপে সুরভি কর গো
মিলনের আহ্লাদে !

পথের স্মৃতি

হাত পেতে বসেছে ভিখারী
রাজপথে মৌন প্রত্যাশায় ;
শাখা মেলি' শীর্ণ তরু সারি
শূন্যমনে আকাশে তাকায়।

লঘু মেঘ চলে যায় ভেসে,—
উপবাসী রহে শাখাদল ;
শাদা মেঘ ভেসে গেল হেসে
পিপাসীরে দিল না সে জল !

ধোয়া ধুতি—রেশ্‌মী চাদর—
চলে গেল ফিরাইয়া মুখ ;
অনুদার বিলাসী বাঁদর
অভুক্তের বুঝিল না দুখ।

সহসা উড়ায়ে ধূলিজাল
ম্লান মেঘ এল বায়ুভরে,—
বজ্রকণ্ঠ মূরতি করাল,—
সেই শেষে দিল স্নিগ্ধ ক'রে !

থামাইয়া থার্ড্‌ক্লাশ্‌ গাড়ী
রুক্ষ মূর্ত্তি দুঃখী গাড়োয়ান
গাড়ী হতে নামি' তাড়াতাড়ি
গরীব গরীবে দিল দান !

শাদা মেঘ দেয় না রে জল,
ম্লান মেঘ ! আয় তোরা আয়,
রিক্ত শাখে হ'বে ফুল ফল
বিন্দু বিন্দু তোদেরি দয়ায় ।

পাগ্‌লা ঝোরা

তোমরা কি কেউ শুন্‌বে নাগো পাগ্‌লা ঝোরার দুঃখ গাথা ?
পাগল ব'লে কর্ব্বে হেলা ? কর্ব্বে হেলা মর্ম্মব্যথা ?
জন্ম আমার হিম-উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি গঙ্গাদিদির পাগল ভাই ।

বরফ-মরুর এক্‌লা জীবন ভাল আমার লাগ্‌ত নারে,
লুকিয়ে উঁকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে ;
সুড়্‌সুড়িয়ে গুড়্‌গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলে
গড়্‌গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে !

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,
পাগ্‌লা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে !
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে
চড়্‌চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জ্বালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনিসুতার রাম্নামালা ;
এক্‌শো যুগের বনস্পতি,—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়,—
মড়মড়িয়ে উপ্‌ড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুম্‌রে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে,—

পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দ ছাড়া আজ্‌কে আমি যাচ্চি ম'রে মনের দুখে ;
যাচ্চি ম'রে মনের দুখে পূর্ব্ব সুখে স্মরণ ক'রে ;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়্‌ছি ঝ'রে।

চক্রী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক দয়া, নাইক স্নেহ !
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্ব্বিবাদে,
মানুষ ছিল কোন্ সুদূরে—সাধিনি বাদ তাদের সাধে ;

তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখ্‌লে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প-আয়ু, আমায় কিনা বাঁধলে শেষে !
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়্‌তে বলে,
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্চি, ক্রমে, পড়্‌ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিন্‌ত যারা বল্‌ছে শোনো,—'যায় না চেনা !'
বাজ্‌বে কবে প্রলয়-বিষাণ ? মুখে আমার উঠ্‌ছে ফেনা !
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো ?
রুদ্রতালে নাচ্‌ব কবে ? তোমরা কেহ বল্‌তে পার ?

দুর্ভিক্ষে

ক্ষিদের জ্বরে যাচ্ছে মারা, ক্ষিদেয় ঘুরে পড়ছে ম'রে !
উপর-ওলার মর্জ্জি, বাবা, একে একে যাচ্ছে স'রে ।

বিকিয়ে গেছে হালের বলদ, দুধ্‌লি গাই বিকিয়ে গেছে,
চালিয়েছিলাম দু' পাঁচটা দিন কাঁসা পিতল সকল বেচে !

বিকিয়ে গেছে লক্ষ্মী মোহর জনার্দ্দনের রূপার ছাতা,
ভিটার গ্রাহক নাইক গাঁয়ে, তাই আজও সব গুঁজ্‌ছে মাথা ।

বিকিয়ে গেলাম পেটের দায়ে, পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা,
কেড়ে খাবার দিন গিয়েছে, কুড়িয়ে খাবার গেছে পালা ;

কচি ছেলের খেয়েছি কেড়ে,—কান্নাতে কান দিইনি মোটে,
চোখে কানে যায় কি দেখা ?—ক্ষিদেয় যখন ভিতর ঘোঁটে ?

প্রথম প্রথম লুকিয়ে খেতাম, চোরের মতন হেথা হোথা,
নিজের ক্ষিদেয় ভুল্‌তে হ'ত ছেলে মেয়ের ক্ষিদের কথা !

ঘাস পাতাতে চল্‌বে ক'দিন ? ক'দিন ওসব সইবে পেটে ?
শুকিয়ে আস্‌ছে ক্ষিদের নাড়ী, কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে ।

ক্ষিদের জ্বালায় জোয়ান মেয়ে দেছে সেদিন গলায় দড়ি,
ক্ষিদের জ্বরে কচি কাঁচা মরছে নিত্যি ঘড়ি ঘড়ি ।

শুষ্‌ছে পড়ে শ্মশান-ভিটায়,—শুষ্‌ছে পড়ে সারি সারি,
সকল গুলোর মুক্তি হলে নির্ভাবনায় মর্ত্তে পারি !

একে একে হ'চ্ছে নীরব খড়ের শেষে কঠিন ভুঁয়ে,
হ'চ্ছে নীরব—যাচ্ছে ম'রে,—বুঝ্‌ছি সবি শুয়ে শুয়ে ।

বুঝতে পারছি—ওই অবধি—জানতে পাচ্ছি মাত্র এই,
মুখে দেব জল দু' ফোঁটা—তেমন ধারাও শক্তি নেই।

মড়ার লোভে ঢুকবে কুকুর,—ভাবতে ওঠে শিউরে গাটা,—
জ্যান্তে পাছে খায় গো ছিঁড়ে, ভাবছি এখন সেই কথাটা।

চোখের আগে অন্‌কি ওড়ে, গায়ে মুখে বস্‌ছে মাছি,
বুঝতেও ঠিক পারছি নাক—মরেছি না বেঁচেই আছি!

হায় ভগবান্! মর্জ্জি তোমার! হায় জগদীশ! তোমার খুসী!
রাখ্‌লে তুমি রাখ্‌তে পার, মারতে পার মারলে রুষি';—

বাঘের ক্ষিদে মিটাও ঠাকুর,—প্রাণ রাখ প্রাণহানি ক'রে;
মানুষ মরে ক্ষিদেয় জ'রে—হাত গুটিয়ে রইলে স'রে!

সংশয়

গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি'
গগনে উঠিছে শঙ্কার সুর ভুবন ভরি'!
রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়ন তারা।

যে দিকে তাকাই কেবলি যে ছাই পড়িছে ঝরি'!
ক্লান্ত পরাণ, দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি;
'কি হ'বে গো'!—কারে সুধাইব, হায়, পাই নে ভাবি',
মধ্য সাগরে ছিদ্র তরণী যায় যে নাবি'!

স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মত আসিছে ঘিরে,
নিশ্বাস হরি' দৃষ্টি আবরি' ঘন তিমিরে;
কোথা শাদা পাল? কই তরী তব? হে কাণ্ডারী!
লোনা জলে একি মিছে মিশে গেল নয়ন-বারি!

সাগর তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার ।
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার !
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তি ঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর ।
স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—

বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর।
তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজ্‌ব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায়;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার।
সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজ্‌ব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ;
সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌ব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।
রাখ্‌ব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগ্‌বে নাকো, অটুট হ'বে ঘর!
উঁচিয়ে মোরা রাখ্‌ব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর—,
সাগরের এই চটি তারা দেখুক্ নিরন্তর।—
দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ্‌ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর!"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দিবে না? নামটি নেবে?—একি বিষম লাজ!

লরেল্

বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহ শিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়।

"লরেল্"

প্রতীচ্য কবির চির সাধের ধন
তোরে আজি হেরি চক্ষে,—লরেল্-পল্লব !
রাজ্যবান রাজা হ'তে পূজ্য যেইজন
সেই লভে লরেলের মুকুট দুর্লভ।

অন্ধকবি হোমরের ছিলি আঁখি তারা,
দান্তের 'প্রথমা প্রিয়া' ছিলি সখি তুই ;
তোরে পরশিয়া আজি আমি আত্মহারা,—
ইচ্ছা করে হে শ্যামাঙ্গী ! শিরে তোরে থুই।

প্রকৃতির প্রাণ-দেওয়া প্রাচীন ছাপরে
গঠিত পল্লব তোর শ্যামল-কোমল,—
রসের রসান্ করা ; কবি বিনা পরে
অরসিকে রূপ তোর কি বুঝিবে ? বল্ !

চির-হরিতের গড়া তনু সুকুমার,
চির-নবীনের শিরে আসন তোমার।

কবি-প্রশস্তি

(ঋষি-কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত)

বাজাও তুমি সোনার বীণা হে কবি ! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে !
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি ভুবন জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা মাঝে নন্দা !
যে ফুল ফোটে স্বর্গ বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা !

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব ।
দর্ভ তব আসন-খানি
অতুল বলি' লইবে মানি,
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব ।

জীবন-ব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ ;
পান্থ এসে পুষ্প-রথে
পৌঁছিলে হে অর্দ্ধ পথে,—
সারথি তব শুভ্র-শুচি কীর্ত্তি অকলঙ্ক !

অর্দ্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পুরে চিত্ত;
সোনার তরী দিয়েছ ভরি',
তবুও আশা অনেক করি;
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

চাতক! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত্ত-সিন্ধু!
মরাল! তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে,
চকোর তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন!
বিষাণ যবে বাজালে, রবি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বদ্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,
দিশারি! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারি তোলো রত্ন।
যে তানে টলে শেষের ফণা,
পেয়েছ তুমি তাহারি কণা,—
অমৃত এনে দিয়েছে শ্রেনে,—নহে সে নহে প্রত্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরাণ-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য;
শোকের রাতে রহিল ধ'রে
হিরণ্ময় মৃণাল ডোরে,
রুদ্রে নিলে বরণ ক'রে রসায়ে নিলে রুক্ষ।

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির-দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগৎ যবে ক্ষিপ্ত ;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা—
চাহ না তবু মুক্তি বিনা,
উজ্জল মনোমুকুর তব হয়নি মসীলিপ্ত।

বাজও কবি ! অলোক বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা গন্ধে ;
যে ভাব ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে,
তোমার নামে মেতেছে দেশ—মিলেছে মহানন্দে।

গহন মেঘে বিজলি সম উজলি' আছ বঙ্গ,
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ !
সূর্য্য সম উজলি' ভূমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল হৃদয়-প্রাণ লভিয়া তব সঙ্গ।

১৪ই

আমার পিতামহ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের
সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে রচিত।

অনেক দেছেন যিনি মানবেরে অকৃপণ করে,—
ধীশক্তির দাতা বলি' মুখ্যভাবে ধ্যান তাঁর করে
আমাদের এ ভারত ; প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায়
মুখরিত করি দিক শ্রেষ্ঠ সে দানের কথা গায়।

সেই শ্রেষ্ঠ বিভূতিতে ছিলে তুমি ভূষিত ধীমান্ !
জ্ঞানাঞ্জনে নেত্র মাজি' বিশ্ব-দৃশ্য দেখিলে মহান্ !

বিজ্ঞানের তূর্য্যনাদে স্তব্ধ করি' দিলে তুচ্ছ কথা,
সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা ত্যজি' নিলে বরি' বিশ্বজনীনতা ;—

অন্ধ বিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত এ বঙ্গ-ভুবনে
এনে দিলে জ্ঞানামৃত ; হ'লে গুরু চক্ষুরুন্মীলনে।
সত্যের করিতে সেবা স্বার্থ, সুখ, স্বাস্থ্য বিসর্জ্জিলে,—
মিথ্যা সংস্কারের মোহ ক্ষয় করি' দিলে তিলে তিলে।

অর্দ্ধ পথে থাম নাই সন্ধি করি' অজ্ঞতার সনে,
সূর্য্যকান্ত মণি তুমি পরিপূর অপূর্ব্ব কিরণে।

(২)

আজি তব মৃত্যুদিনে, ওগো পূজ্য ! ওগো পিতামহ !
এনেছি যে দীন অর্ঘ্য—তুমি সে প্রসন্ন মনে লহ।
বার্ষিকী এ শ্রাদ্ধে তব পিণ্ডভোজী ডাকিনি ব্রাহ্মণ,
জানি তাহে হইত না, ওগো জ্ঞানী ! তোমার তর্পণ ;

অন্তরের শ্রদ্ধা শুধু আমি আজি করি নিবেদন ;—
এই তো যথার্থ শ্রাদ্ধ—কীর্ত্তি-কথা স্মরণ কীর্ত্তন।
সত্য-দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা চাই,—
বুদ্ধেরে পূজিতে যেন রক্তধারে বেদী না ভাসাই ;—

অবতার বলি' মুখে, যেন, হায়, অজ্ঞতার ফলে
রঘুবীরে না বসাই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহের দলে ;—
তব প্রিয় কর্ম্ম ত্যজি' যেন তব তর্পণে না বসি'
বিদ্যা তপ বিবর্জ্জিয়া শুধু যেন কৌলীন্য না ঘোষি'।

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী ! হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।

অর্ঘ্য

(কবি-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র সভ্যদিগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)

নেতধটি মোরা পাই নাই খুঁজে,
বিশ আড়া ধান আনিনি কবি !
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি—
বিকচ কমল কোমল ছবি।
পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি,
আঁখিজলে শুধু করি' অভিষেক
দর্ভ আসনে বসাতে চাহি।
জীবনের বহু শূন্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছ বীণার তানে,
অন্ধ যামিনী হেসেছে পুলকে,—
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য ?
কোথা পাব মোরা ভাবি গো তাই ;—
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই !
ব্রহ্মবিদের তুমি বরেণ্য,—
কাব্য-লোকের লোচন রবি !
স্বর্গে বসিয়া আশীষিছে তোমা,
ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী।
শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
তোমার যোগ্য নাহিক অর্ঘ্য,—
তবু লও প্রীতি রাখীর ডোরা।

চৌদ্দ প্রদীপ

চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবন উজল করি,
বিস্মৃত শত অমা-যামিনীর কাজল হরি ;
পিতৃযানের অজানা আঁধারে আলোক জ্বালি,
আলোর রাখীতে বাঁধি গো অতীতে,—ঘুচাই কালি
মৃত্যু গহনে বিস্মৃত জনে স্মরণ করি,
স্মৃতি-লোকে সবে জাগাই পুলকে চিত্ত ভরি'।
কল্পনা দিয়ে করি গো সৃজন কল্প-লতা,—
অশ্রু-হিমানী জড়িত আকাশে অতীত-কথা !

চৌদ্দ প্রদীপে সপ্ত ঋষিরে স্মরণ করি,
ত্রিশঙ্কু আর বিশ্বামিত্রে বরণ করি ;
স্মরি অগস্ত্যে—ফেরে নি যে আর যাত্রা ক'রে,
স্মরি গো বুদ্ধে—জ্ঞানে প্রেমে যার ভুবন ভরে ;
স্মরি পরাশরে—তার রাক্ষস-সত্র-কথা,
স্মরি মৈত্রেয়ী অরুন্ধতীরে পতিব্রতা ;
বাল্মীকি আর কালিদাস কবি জাগিছে মনে,
দোলাইয়া শিখা নমিছে প্রদীপ দ্বৈপায়নে।

ভীষ্মের স্মৃতি উজলিছে দীপ হৃদয়-লোকে,—
সারা ভারতের পিতামহ সেই অপুত্রকে।
জাগিছে ভরত সর্ব্বদমন ভারত-আদি,—
অশোক-প্রতাপ-পৃথ্বী-বিজয়সিংহ-সাথী !
জাগে বিক্রম অভিনব নবরত্নে ধনী,
যবনী রাণীর বক্ষে জাগিছে মৌর্য্যমণি।
লুপ্ত দিনের বিস্মৃতি-লেপ ঘুচেছে কালো,
চৌদ্দ প্রদীপে আজিকে চৌদ্দ ভুবন আলো।

কোলাকুলি আজ তিমিরে দোলায়ে আলোর দোলা !
চৌদ্দ যুগের চৌদ্দ হাজার ঝরোখা খোলা !
এ পারে প্রদীপ উল্কা ওপারে উলসি' ওঠে,
পিতৃযানের মাঝখানে আজ বার্ত্তা ছোটে ;
আনাগোনা আজ জানা যেন যায় আকাশ 'পরে,
পিতৃগণের পদ-রেণু আজ আঁধারে ঝরে !
আঁধার-পাথারে আকুল হৃদয় পেয়েছে ছাড়া,
চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবনে জেগেছে সাড়া ।

হাহাকার

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষুকের মত
কেঁদে কেঁদে ওঠে সে নিয়ত,
রোদন উদ্যমে অবসান,
আছে শুধু বদন-ব্যাদান !
আছে বুকে বুভুক্ষার মত
জগতের ক্ষুণ্ণ খেদ যত,
আছে শুধু যমের যন্ত্রণা
প্রেতলোকে জাগাতে করুণা !
এ সংসার অন্ধ-কারাগার,
কোনোদিকে মিলে না দুয়ার ;
ক্ষুণ্ণ প্রাণ, সংক্ষুব্ধ বেদনা,
কেবল পিঞ্জরে আনাগোনা ।
এ পিঞ্জর ভাঙ ভগবান,
শোক তাপ হোক্ অবসান ;
এ উৎকট রোদনের শেষ
কর, কর, কর পরমেশ !

দেশবন্ধু

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদে গীত)

বন্ধুর ভালে চন্দন-টীকা কণ্ঠে কমল-মালা,
দেশ-বন্ধুর শুভ আগমনে হৃদি-মন্দির আলা !
মাধবে মাধবী-কঙ্কণ বাঁধ বন্ধুর মণিবন্ধে,
লোক-বন্ধুর গৌরব-গাথা গাঁথ মনোরম ছন্দে ;
বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা,—
ইন্দু-কিরণ-নিন্দিত যাঁর মুকুট-রশ্মি-জ্বালা !
বন্ধুর তরে তোরণ রচনা করেছে নূতন বর্ষ,—
নবীন পুষ্পে নব কিশলয়ে ; উথলে নবীন হর্ষ !
বর্ষণ করে লাজ-অঞ্জলি কল্যাণী পুরবালা,
জনবন্ধুর আগমন-পথে লক্ষ কুসুম ঢালা ।

নিশান্তে

আঁধার ঘরের বাহিরে কে ওই
    হের দেখ ওগো চাহিয়া !
সমীর এনেছে কার সংবাদ
    সুপ্তি-সাগর বাহিয়া !
রুদ্ধ দুয়ার খুলে দাও, আঁখি মেলে চাও,
কমল-কোরক ধ্যানে কি জানিল—জেনে নাও,
চঞ্চল হ'ল আহ্লাদে পাখী
    উড়িছে-পড়িছে গাহিয়া ;
স্ফুরিছে আলোক ঝুরিছে গন্ধ
    প্রেম-নীরে অবগাহিয়া ।

বিশ্ববন্ধু

(বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম্ ষ্টেডের মৃত্যু উপলক্ষে)

গ্রহণ-বর্জ্জিত শুচি সূর্য্য সম নিত্য নির্ণিমেষ
নিয়ন্তার নেত্রবিভা পশেছিল ও তব পরাণে ;
তাই জান নাই শঙ্কা, তাই তুমি মান নাই ক্লেশ,
বিবাদ, বিপদ, বিঘ্ন ; টল নাই নিন্দা অপমানে।

হে তেজস্বী ! অগ্নি-সত্ত্ব ! হে তপস্বী ! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে ; তোমার নাহিক আত্মপর ;
ঘোষণা ক'রেছ তুমি নিত্য সত্য ; চিত্ত স্বার্থ-লেশ-
শূন্য তব চিরদিন ; ধৃতব্রত তুমি ঋতম্ভর।

"জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়ে ন্যায়-নিষ্ঠ শুচি অনুষ্ঠানে"
এ তোমার মূলমন্ত্র,—এ তোমার প্রাণের সাধনা ;
জয়-ডঙ্কা-নাদে তাই আতঙ্কিত হ'তে তুমি প্রাণে
দুর্ব্বলের পীড়াভয়ে। বিশ্ব-মানবের আরাধনা,—

সনাতন ন্যায়-ধর্ম্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত ;—
কত অভিচার-মন্ত্র নষ্টবীর্য্য তব শঙ্খ রবে !
হে বিশ্বাসী ! বিশ্ববন্ধু ! ওগো কর্ম্মী উদার-চরিত !
নিঃস্ব নির্জ্জিতের পক্ষে একা তুমি যুঝেছ গৌরবে।

হে ধর্ম্মিষ্ঠ ! আত্মনিষ্ঠ ! লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি
অন্তে তুমি সমুদার ! মানুষের রাজ্যের বাহিরে ;
ঊর্দ্ধে শুধু নীলাকাশ—সীমাহীন, অনন্ত, অনাদি,
নিম্নে লীলায়িত নীল উচ্ছ্বসিত চন্দ্রমা-মিহিরে।

তোমার সমাধি ভঙ্গ করিবে না তরঙ্গ দুর্জ্জয়,
আত্ম-প্রাণ-দানে তব আর্ত্তত্রাণ ঘটেছে সুক্ষণে ;
কীর্ত্তনীয় তব নাম ; কীর্ত্তি তব অমর অক্ষয়,
ক্ষাত্রধর্ম্ম মূর্ত্ত তুমি, হে যশস্বী ! জীবনে মরণে।

শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে

আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,—
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উল্কাতরল জ্বালার মালা !
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব্ব,—শ্মশান শুধু হ'চ্ছে আলা,
যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা,
পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে,
ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুল্‌বুলেতে,—
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে ;
পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্ত্তমানের বাবিল্-চূড়া,
দানেশ-মন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিবল উজল একটি তারা,
রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা ;
নিবে গেল অমূল্য প্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা,
বঙ্গভূমির ললাট 'পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন অলৃগা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাব্‌না যা' সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,

প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ দেশান্তে ছুট্‌ছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জর্ম্মনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জ্বেলে শিখ্‌ছে ওরা কলাকল ;

হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,

সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

পুনর্নব

আমার প্রাণের গানটি নিয়ে
গাইলে কে গো আমার কানে ?
বন্ধ হ'ল কণ্ঠ আমার
উথ্‌লে-ওঠা অশ্রু-বানে !
আমারি বাসন্তী গীতি—
আমারি সে কণ্ঠ নিয়ে,
আজি এ ঘুমন্ত রাতে
কে যায় গো ওই গেয়ে গেয়ে !
যে গান আমার কণ্ঠে ছিল
ফুট্‌ল সে আজ কাহার তানে ;
হারা দিনের লুপ্ত ধারা
জাগ্‌ল সে কি নূতন প্রাণে !

শীতান্তে

আজিকে শীতের শেষ সবুজের নবোন্মেষ,
জলস্থল বিকাশ-বিহ্বল !
মত্ত হাওয়া হাহা স্বরে কারে যেন খুঁজে মরে,
দেহ প্রাণ আকুল চঞ্চল।
মন তবু আজি কয় এ উৎসব কিছু নয়,
আমি আর নহিক ইহার ;
সকল হাসির মাঝে আমি দেখিতেছি রাজে
আজ শুধু কঙ্কালের হার !
আমি শুধু ছায়া গণি' শুনি' নিজ পদধ্বনি
খুঁজে ফিরি বিশ্বের দুয়ার,
চরায় ঠেকেছে তরী,— আমি শুধু ভেবে মরি,—
ফিরিল না এখনো জুয়ার !
দুই পারে আনাগোনা দুই পারে যায় শোনা
আনন্দের মৃদু কোলাহল,
আমি হেথা কর্ম্মহীন ব'সে আছি দীর্ঘ দীন,—
দীর্ঘ দীন বেদনা-বিহ্বল !
দুনিয়ার দুই পিঠে মরা বাঁচা দুই মিঠে,
তিক্ত শুধু ম'রে বেঁচে থাকা ;—
পুতুলের প্রাণ ধ'রে খেলাঘরে বাস ক'রে
কলের টিপনে ডাক ডাকা।
আর না, আর না খেলা, ডেকে লও এই বেলা,
লীলাময় ! আর কেন, হায় !
মরণ-সিন্ধুর নীরে তুফান তুলিয়া, ধীরে
ডুবাইয়া লও করুণায়।

ফুল-শির্ণি

মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক আহূত সভায় কোজাগর পূর্ণিমায় পঠিত।

গুগ্‌গুলু আর গুলাবের বাস
মিলাও ধূপের ধূমে !
সত্যপীরের প্রচার প্রথমে
মোদেরি বঙ্গভূমে।
পূর্ণিমা রাতি ! পূর্ণ করিয়া
দাও গো হৃদয় প্রাণ ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু মুসলমান !
পীর পুরাতন,—নূর্ নারায়ণ,—
সত্য সে সনাতন ;
হিন্দু মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হ'ন্।
তাঁরি ইশারায় মিলিয়াছি মোরা
হৃদয়ে জ্যোৎস্না জ্বালি' ;
তাঁহারি পূজায় সাজায়ে এনেছি
ফুল-শির্ণির ডালি।
পুলকের ফেনা সফেদ্ বাতাসা
শুভ্র চামেলি ফুল,—
হৃদয়ের দান প্রীতির নিদান
আলপের তাম্বুল !

মিলন-ধর্ম্মী মানুষ আমরা
মনে মনে আছে মিল্,
খুলে দাও খিল, হাস্থক নিখিল
দাও খুলে দাও দিল্ !
হিন্দু-মুসলমানে হ'য়ে গেছে
উষ্ণীষ-বিনিময়,
পাগ্ড়ী-বদল-ভাই—সে আদরে
সোদর-অধিক হয়।
স্থফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি
আমাদের এই দেশে !
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে
বাউলে ও দরবেশে !
বাহারে মিলায়ে বসন্ত রাগ,—
সিন্ধুর সাথে কাফি,—
এক মার কোলে বসি' কুতূহলে
মোরা দোঁহে দিন যাপি।
মিলন-সাধন করিছে মোদের
বিশ্বদেবের আঁখি,
তাঁর দৃষ্টিতে হ'য়ে গেল ফুল-
শির্ণিতে মাখামাখি !
গুগ্গুলু জ্বালি' ধূপের ধোঁয়ায়
মিলায়ে দাও গো আজি,
বাণী-মন্দিরে বীণার সঙ্গে
সিতার উঠেছে বাজি' !

ভোজ ও পুত্তলিকা

(৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র দর্শনে)

যে এসেছে আজ আসনে বসিতে
তারো ভালে রাজ-টীকা,
তবে কেন তোরা হইলি বিমুখ
ওরে ও পুত্তলিকা !
তোরা কী বলিবি ? চিরনির্জীব
তোদের কী আছে কথা ?
পুতুল থাকিবি পুতুলের মত ;—
কেন এই বাতুলতা ?
চাষারে তো ক'রে তুলেছিলি রাজা,—
তাহাতে তো ছিলি রাজী,
ভোজরাজে দেখি তবে কেন হেন ?
কেন এই ভোজবাজী ?
চোখ, মুখ—সব থাকে পুতুলের,
তবু সে কহে না কথা,
পুরাণো সে ধারা ভেঙে চূরে দিবি ?—
সনাতন মৌনতা ?
পুতুল হইয়া তর্ক করিবি ?
ছেড়ে চলে যাবি পায়া ?
ভোজ বসে যদি এ মহা-আসনে ?—
নাই কিরে দয়া মায়া ?
বত্রিশখানা হ'য়ে চ'লে তোরা
যাবি বত্রিশ দিকে ?

জনমের মত ধূলিসাৎ করি'
পুরাণো আসনটিকে ?
বিক্রম এই আসনে বসেছে ?
বসেছে ;—তাহাতে কিবা ?
তার পরে কত বসেছে কুকুর,
বসেছে তো কত শিবা।
তোরা তো মাত্র পুতুল ; তোদেরো
আছে নাকি মতামত ?
যা'হোক্ কিন্তু, খুব দেখাইলি ;—
চরণে দণ্ডবৎ !
রাজা নিজে খাড়া রয়েছে সমুখে,—
তাহারে বসিতে বল্,
তা' না,—জুড়ে দিলি প্রশ্নের পরে
প্রশ্ন অনর্গল !
গল্পের পরে গল্প চ'লেছে
নাম নাই ফুরাবার,
লগ্ন ফুরায়ে যায় যে এদিকে,
খবর রাখিস্ তার ?
ভোজ হ'তে নয় বিক্রমই বড়,—
বড় বত্রিশ বার ;
তা' বলে আসনে বসিতে দিবি না ?-
এই কি শিষ্টাচার ?
বড় মুখ করে এসেছে বেচারা,—
ওরে তোরা দয়া কর ;
দেখ দেখি কত ডঙ্কা, নিশান,
কত সে আড়ম্বর !

দধি, দর্পণ, দূর্ব্বা এনেছে
সাজায়ে সোনার থালে,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ছবি
লিখেছে বাঘের ছালে !
বিক্রম সম সাহসটি ঠিক
না হয় নাহিক বুকে,—
না হয় অবোধ ঘোষণা ক'রেছে
নিজ যশ নিজমুখে ;—
তবু, একবার বসিতে দে, আহা
কেন থাকে মনে খেদ ;—
এ কি ! যাস্ কোথা ?—না ফুরাতে কথা
মাঝখানে দিলি ছেদ !
সওয়াল-জবাবে নাকাল করিয়া
শেষে দিলি পিট্টান !
'হাপু-গেলা' হ'য়ে হবু-মহারাজ
হাপুস্ নয়নে চান্ !
পাষাণের প্রাণ নেহাৎ তোদের,
না, না, খুড়ি, কেঠো প্রাণ,
বাদ্যভাণ্ড করিয়া পণ্ড
হ'লি অন্তর্ধান !
কালকূটে ভরা চামচের মত
দিনে ওড়ে চামচিকা,
রাজটীকা তোরা ব্যর্থ করিলি,
নারাজ পুত্তলিকা !

পরীক্ষা

আমারে আজিকে ফেলেছিলে প্রভু !
বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় ;
নব জীবনের দুয়ার যে সেই,—
আমি তো আগে তা' বুঝিনি, হায় !

উদ্ধারি' মোর মুকতি-মন্ত্র,—
মোর অজ্ঞাত আমারি বল,
করি' প্রবুদ্ধ করিলে শুদ্ধ,
হৃদয় করিলে সুনির্ম্মল ।

সহসা পড়িল বজ্রের শিখা
নিরালয় মোর পরাণ 'পরে,
জ্বলে গেল যত গ্লানি জঞ্জাল,
গেল জ্বলে গেল ধূ ধূ ধূ ক'রে ।

সে যে উর্ব্বর ক'রে দিয়ে যাবে
সে কথা জানিতে পারি নি আগে,
আমি ভেবেছিনু মূর্ত্তিমন্ত
মরণ আজিকে আমারে ডাকে !

একেবারে শত লেলিহ রসনা
লেহন করিতে লাগিল দেহ,
বিশুষ্ক তালু-লগন জিহ্বা,
ফুকারি' ডাকিতে নাহিক কেহ ।

রোম-কণ্টকে ভরিল শরীর
মূর্চ্ছা হাসিল মদির হাসি,
তখনো জানি নি তুমি সে নিভৃতে
করিছ শিথিল মোহের ফাঁসী।

চপল মনের শেষ নির্ভর
অন্তরযামী জানিতে একা,
আগুনে পোড়ায়ে করি' পবিত্র
চিত্তে আবার দিলে হে দেখা।

যত পণ করি আপনার মনে
বারবার তাহা টুটিয়া পড়ে,
তাই করুণায় কঠোর হ'য়েছ
শক্তি প্রেরণা করিতে জড়ে।

শ্যামিকায় তুমি শুদ্ধ করেছ,
উজল করেছ, করেছ খাঁটি,
দুঃসহ তাপে তপ্ত ক'রেছ,
তাই তো ঝরেছে মলা ও মাটি।

রুদ্র-মূরতি! তোমার আরতি
করিতে আজিকে শিখেছি, প্রভু!
বারে বারে মোরে কোরো পরীক্ষা,
দুর্ব্বলে ভুলে থেক না, কভু।

আকিঞ্চন

ভেঙে আমায় গড়তে হবে, প্রভু !
মনের মতন করতে হবে, মন !
অভাজনের এই নিবেদন, ওগো !
দুর্ব্বলের এই প্রাণের আকিঞ্চন !
ক্ষণে ক্ষণে পড়ছি দেখ হেলে'—
ঢেউগুলো সব যাচ্ছে আমায় ঠেলে,—
প্রাণের ভিতর শক্তি নাহি মেলে,
ঠাকুর আমার ! আমার নিরঞ্জন !

লক্ষ ঠাঁয়ে নোয়াই মাথা, প্রভু !
দেখাদেখি ছোঁয়াই মাথা পায়ে,
চল্‌তে বাঁয়ে ডাইনে কেবল চাহি
ডাইনে যেতে তাকাই ফিরে বাঁয়ে !
মনে মনে জান্‌ছি যেটা মেকী
পরের চোখে তারেই খাঁটি দেখি !
ভয় করি হায়,—বল্‌বে শেষে কে কি ;-
আঁচড় কি আঁচ লাগ্‌তে না পায় গায়ে।

পঙ্গু হ'য়ে পড়ছি এম্‌নি ক'রে
সায় দিয়ে যে ফেল্‌ছি গো না বুঝে !
বিকিয়ে গেল মগজ-মহাল-খানা
সই দিয়ে হায় চক্ষু দুটি বুজে ;
জীর্ণ চাকা অভ্যাসেরি রথে
চল্‌ছি প্রভু ! সর্ব্বনাশের পথে,
খুল্‌ছে নাকো দৃষ্টি কোনো মতে,
দিগ্বিদিকের ঠিক নাহি পাই খুঁজে।

সাম্নে বিপদ চক্ষে নাহি দেখি,
দারুণ আঁধার নাই গো আমার সাথী ;
বাঁচাও তুমি বাঁচাও মোরে, প্রভু !
জাগাও প্রাণে তোমার অমল ভাতি।
মনকে আমার মনের মতন কর,
ওগো প্রভু ! ভেঙে আমায় গড়,
সৃষ্টি তুমি কর নূতনতর
ফোটাও ফুলে বজ্র-অনল-পাঁতি !

ক্ষীণ,—সে ক্রমে হ'চ্চে নিষ্করুণা—
রক্ষা কর, রক্ষা কর স্বামী !
কুণ্ঠা, গ্লানি দগ্ধ তুমি কর
হে বজ্রধর ! মর্ম্মে এস নামি' ;
পণ্ড শত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সে
স্মৃতির হ্রদে শবের মত ভাসে,
টান্‌ছে আমায় সর্ব্বনাশের গ্রাসে,-
বাঁচব তবু তোমার কৃপায় আমি।

দয়া আমায় করতে তোমায় হ'বে
মনের মতন করতে হ'বে মন,
নূতন কথা নয়কো এ তো প্রভু !
এ যে তোমার বিধান সনাতন ;
গড়তে বসে খেল্‌ছ ভাঙন খেলা,-
জগৎ জুড়ে চিহ্ন যে তার মেলা !
ভেঙে গড়ে তুচ্ছ মাটির ঢেলা
করলে মানুষ,—দিলে জ্ঞানাঞ্জন !

সৃজন-লীলার প্রথম হ'তে প্রভু !
ভাঙাগড়া চল্‌ছে অনুক্ষণ,
পাখী জনম শাখী জনম হ'তে
রাখ্‌ছ কথা—শুন্‌ছ নিবেদন ;
আজ কি হঠাৎ নিঠুর তুমি হবে ?
কান্না শুনে নীরব হ'য়ে র'বে ?
এমন কভু হয় না তোমার ভবে,
মনে মনে বল্‌ছে আমার মন !

আমায় তুমি পক্ষী-মাতার মত
যুগে যুগে করলে আচ্ছাদন,
আকাশ-ডানা দিগন্তে তাই নুয়ে
নীড়ের তৃণ করছে আলিঙ্গন !
সকল ধনে করলে আমায় ধনী,
পদ্ম-ফুলে রাখ্‌লে প্রভু ! মণি,
বুদ্ধি দিলে—যোগ্য আমায় গণি'
তবু আমার ভরল না, হায়, মন।

এবার আমায় কর্ত্তে হবে খাঁটি
ওগো আমার দীপ্ত হুতাশন !
পুড়িয়ে দেবে সকল মলামাটি,—
রাঙিয়ে আমায় নেবে নিরঞ্জন !
পাখী শাখী মানুষ হল, তবু,
মনের মতন মন হ'লনা কভু,
ভেঙে আমায় গড়তে হ'বে প্রভু !
মনের মতন করতে হবে মন।

আমি

তোমরা সবাই যা' বল ভাই, আমি তো সেই আমিই,
সমান আছি সকল কালে,—সমান দিবাযামী ;
আমি তো সেই আমি।
বাইরে থেকে দেখ্‌ছে লোকে,—
বেজায় বুড়ো,—চশ্‌মা চোখে,
মুখোস্ দেখে যাচ্ছে ঠ'কে,—ভাব্‌ছে "এ নয় দামী" !
কিন্তু আমি জান্‌ছি মনে—আমি তো সেই আমি !
ভিতরে যে মনটি আছে
উল্লাসে সে আজো নাচে,—
নাচ্‌ত যেমন বাল্যে পেলে মুড়কি-লাড়ুর ধামী ;
আমি তো সেই আমি !
বাইরে ভেঙে পড়ছে মাজা
কিন্তু আছে প্রাণটি তাজা,
যৌবনে সে যেমন ছিল হৃদয়-মধু-কামী ;—
আমি তো সেই আমি।
মায়ের দুলাল, মিতার মিতা,
দাদার ভাইটি, ছেলের পিতা,
সীতার শ্রীরাম—তার মানে ওই গৃহিণীটির স্বামী ;
আমি তো সেই—আমি।
শানাই-বাঁশী—কানাই-বাঁশী—
আগের মতোই ভালবাসি
ভালবাসি রঙ্গ হাসি—যায়নি লেহা থামি' ;—
আমি যে সেই আমি।

ফুলের গন্ধ চাঁদের আলো
আগের মতোই লাগে ভালো
আবীর-মাখা মেঘের কোণে সূর্য্য অস্ত-গামী ;
আমি যে সেই আমি।
সকল শোভা সুখের মাঝে
আমার আমি মিশিয়ে আছে,—
মোহন-মালার মধ্যিখানের পান্না-হীরার খামি ;—
আমি গো এই আমি।
দেখ্‌ছ বুড়ো বাইরে থেকে,—
রায় দিতে হয় ভিতর দেখে,
দু'টো হিসাব ভজ্‌লে তবে মিল্‌বে সাল্‌তামামী ;
আমি যে সেই আমিই।

আবার

যেদিন আবার ফুট্‌বে মুকুল
সে দিন আমায় দেখ্‌তে পাবে ;
ফাগুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাক্‌ব দূরে কোন্ হিসাবে !
আস্‌ব আমি স্বপন ভরে,
গভীর রাতে ভুবন 'পরে ;
হাস্‌ব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে !
তোমরা যখন কইবে কথা
শুন্‌ব আমি শুন্‌ব গো তা',
আমার কথা হঁরষ-ব্যথা
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে !

জাগিয়ে রেখ একটি তারার আলো,
একটু দয়া রেখ আমার 'পরে,—
চোখে যখন দেখ্‌তে না পাই ভালো
দু' চোখ যখন চোখের জলে ভরে,—
গহন আঁধার, অকূল পাথার, আবিল কুজ্ঝটিকা,-
জ্বালিয়ে রেখ তোমার প্রেমের শিখা।

বিপুল জগৎ ক্ষুদ্র হ'য়ে এলে
ঠাঁই যেন পাই তোমার ছায়ায় প্রভু।
নীল আকাশে ক্লান্ত আঁখি মেলে
শান্তি যেন পাই পরাণে, তবু!
চক্ষে ধারা, বাইরে আঁধার—দ্বিগুণ কুজ্ঝটিকা,
জাগিয়ে রাখ অমর প্রেমের শিখা।

বাইরে যখন লজ্জাতে শির নত,—
নিস্ফলতার নিঃস্ব নিশাস প্রাণে,
অন্তরেতে অপমানের ক্ষত
রসাতলের পথে যখন টানে,—
বুকে যখন জ্বলে সঘন সর্ব্বনাশী চিতা,
দয়া রেখো পিতা আমার পিতা!

একটি তারার একটু শুভ্র আলো
জাগিয়ে রেখ আমার যাত্রা-পথে,
ঘিরবে যেদিন মৃত্যু-আঁধার কালো
ফিরতে যেদিন হ'বে নীরব রথে,
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তনু তিতা;—
দয়া রেখ পিতা! আমার পিতা!

নফর কুণ্ডু

নফর নফর নয়,—এক মাত্র সেই তো মনিব
নফরের দুনিয়ায় ; দীন হীন প্রতি জীবে শিব
প্রত্যক্ষ ক'রেছে সেই। নহিলে কি অস্পৃশ্য মেথরে
বিপন্ন দেখিয়া, নিজ প্রাণ দিতে পারে অকাতরে
দুঃস্থের উদ্ধার লাগি' ? পঙ্কে সে মানে নি অগৌরব ;
সে শুধু মানস-চক্ষে দেখেছে গো বিপন্ন মানব ;
শুনেছে মনের কানে মুমূর্ষু জনের আর্ত্তরব,—
অমনি গিয়েছে ভুলে পুত্র, জায়া, পিতা, মাতা,—সব,—
গৃহ, গৃহস্থালী-সুখ ; বাষ্প-বিষ-বিহ্বল-গহ্বরে
নেমেছে অকুতোভয়ে ;—একটি সে জীবনের তরে।
একটি প্রাণের লাগি' নিজ প্রাণ দেছে মহাপ্রাণ।
স্বদেশী বিদেশী মিলি' স্মরে আজি পুণ্য অবদান
নিঃস্ব এই নফরের। নফর আজিকে পুণ্যশ্লোক ;
আলোকিছে মাতৃভূমি শুভ্র তার সুকৃতি-আলোক।

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;-
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্‌লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে ;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সুচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

ঋষি টলষ্টয়

সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ছিল জগজন
অন্ধকূপে বন্দী, সম ; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন,
ওগো ঋষি রুষিয়ার ! মুক্ত রন্ধ্রে স্বর্গের বাতাস
প্রবেশিল অন্ধকূপে ; বিশ্ববাসী বাঁচিল নিশ্বাস

ফেলি ; ওগো টলষ্টয় ! বিনাশিলে তুমি মহাভয়
মানবের ; প্রচারিলে পৃথ্বীতলে বিশ্বাসের জয়।
মহাবৈষম্যের মাঝে প্রচারিলে সাম্যের বারতা,
উচ্চারিলে দ্রষ্টা ! তুমি, মহামিলনের পূর্ব্বকথা !

বাণী তব মৃত্যুহীন মৃত্যুময় এ মর্ত্ত্যভুবনে
ওগো মৃত্যুঞ্জয় কবি ! হে মনীষি জাগে আজি মনে
সিদ্ধার্থের সুপ্ত স্মৃতি,—তোমার শুনিয়া কণ্ঠরব
সেই সুর, সেই কথা ; তারি মত—তারি মত সব !

সেই ত্যাগ ! সেই তপ ! সেই মহামৈত্রীর বাখান !
বুদ্ধকল্প বিশ্বপ্রেমে বর্ত্তমানে তুমি মহাপ্রাণ !

কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন ; কালোরে কে করিস্ ঘৃণা ?
আকাশ-ভরা আলো বিফল কালো আঁখির আলো বিনা।
কালো ফণীর মাথায় মণি,
সোনার আধার আঁধার খনি ;
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা ;
কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা !

কালো মেঘের বৃষ্টিধারা তৃপ্তি সে দেয় তৃষ্ণা হরে,
কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্যামসায়রে !
কালো অলির পরশ পেলে
তবে মুকুল পাপ্‌ড়ি মেলে,—
তবে সে ফুল হয় গো সফল রোমাঞ্চিত বৃন্ত 'পরে ;
কালো মেঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে।

সন্ন্যাসী শিব শ্মশান-বাসী,—সংসারী সে কালোর প্রেমে ;
কালো মেয়ের কটাক্ষেরি ভয়ে অসুর আছে থেমে।
দৃপ্ত বলীর শীর্ষ'পরে
কালোর চরণ বিরাজ করে,
পুণ্য-ধারা গঙ্গা হ'ল—সেও তো কালো চরণ ঘেমে ;
দুর্ব্বাদলশ্যামের রূপে—রূপের বাজার গেছে নেমে।

প্রেমের মধুর ঢেউ উঠেছে কালিন্দীরি কালো জলে,
মোহন বাঁশীর মালিক যেজন তারেও লোকে কালোই বলে ;
বৃন্দাবনের সেই যে কালো,—
রূপে তাহার ভুবন আলো,
রাসের মধুর রসের লীলা,—তাও সে কালো তমাল তলে ;
নিবিড় কালো কালাপানির কালো জলেই মুক্তা ফলে।

কালো ব্যাসের কৃপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি ;
কালো বামুন চাণক্যেরে
আঁটবে কে কুট-নীতির ফেরে ?
কাল-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাব্‌সী কালো লোক্‌মানেরে মানে আরব আর ইরাণী।

কালো জামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে—
কালোর আলো জ্বল্‌ছে আজো, আজো প্রদীপ যায়নি নিবে ;
কালো চোখের গভীর দৃষ্টি
কল্যাণেরি করছে সৃষ্টি,—
বিশ্ব-ললাট দীপ্ত—কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত চোখের ঠাণ্ডা কাজল—তৈরী সে এই ম্লান প্রদীপে।

কালোর আলোর নেই তুলনা—কালোরে কী করিস্ ঘৃণা!
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল—চোখের তারা বিনা ;
কালো মেঘে জাগায় কেকা,
চাঁদের বুকেও কৃষ্ণ-লেখা,
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা,
কালোর গানে জীবন আনে নিথর বনে বয় দখিনা!

১০

জ্যোতির্ম্মণ্ডল

যাঁহাদের পুঞ্জ তেজে দীপ্ত আজি বঙ্গের গগন,
বাঙালীর চিত্তপটে তাঁহাদের একত্র মিলন!
মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় করেন বিরাজ,
সৌর জগতের সত্য সাহিত্য-জগতে হের আজ
হ'য়ে আছে সপ্রমাণ! ঊর্দ্ধে তার নিস্পন্দ আলোক;—
যুগ-যুগন্ধর রাজা আছেন রচিয়া ধ্রুব-লোক;
আর্ষ-লোক পার্শ্বে তার,—তপঃ ক্লিষ্ট সপ্তর্ষি মণ্ডল,—
স্তব্ধ, শান্ত সুগম্ভীর পুরাতন জ্যোতিষ্কের দল,—
অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী বিদ্যার সাগর,—
দূরতায় মন্দীভূত রশ্মি তবু স্পষ্ট সুগোচর।
রবির দক্ষিণভাগে বঙ্কিম বঙ্গের বৃহস্পতি;
বামে মধু শুক্রগ্রহ;—বিতরিল যেই শুভ্র জ্যোতি
রবি উদয়েরও আগে। শূন্যে শোভে নীহারিকা-সেতু,
উল্কা আছে, গ্রহ আছে, আছে তারা, আছে ধূমকেতু।

পথের পঙ্কে

পথের পঙ্কে পড়েছে যে ফুল
ওগো! তারো পানে ফিরিয়া চাও!
তার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মুখ
তুমি স্নেহভরে মুছায়ে দাও!
এখনো যে তার মৃদু-সৌরভ
নীরবে জানায় তারি গৌরব,
তারে পায়ে দলে যেয়ো না গো চলে,
বেদনা তাহার তুমি ঘুচাও!

পরুষ পরশে তারে ছুঁয়ো নাক'—
পাপ্‌ড়ি পড়িবে টুটিয়া,
নব বেদনায় ব্যথিত সে, হায়,
কাঁদিবে লুটিয়া লুটিয়া ;
শুধু ভালবেসে নাও যদি তুলে
গ্লানি কলঙ্ক সব যাবে ভুলে,
মরিবার আগে নব অনুরাগে
মনোপ্রাণ তার যদি জুড়াও।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি!
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী!

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

যথার্থ সার্থকতা

আমার কামনা বিফল করিয়া
আমারে সফল কর, নাথ !
আবিল হৃদয়ে আঁখিজল ধুয়ে
প্রভু ! তুমি ধীরে ধর হাত !
কোন্ পথে যাব শুধু তুমি জান,—
কোথা আছে মম ঠাঁই,
ভাঙা বাঁশী আর কি কাজে লাগিবে
আমি শুধু ভাবি তাই !
সাধ ক'রে শুধু ঘটেছে বিষাদ
আর করিব না কোনো সাধ,
হীন এ হৃদয়ে দীনতা শিখাও,
চরণে করিহে প্রণিপাত।

বন্দরে

শাস্ত্র-শাসন রইল মাথায়, তর্ক মিছে,—নেইক ফল ;
বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ,—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
বাজে কথায় কান দিয়োনা, কান দিয়োনা ক্রন্দনে,
দুল্‌তে হ'বে সিন্ধু-দোলায় বিরাট বুকের স্পন্দনে।

সাগর-পথে যাত্রা-নিষেধ ? লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধুমাঝে—মুক্তাভরা শুক্তি ও ;
ফিরব মোরা দশটা দিকে রত্নাকরের বুক চিরে,
রত্ন নেব, মুক্তা নেব, সঙ্গে নেব লক্ষ্মীরে।

বাণিজ্যে সে বসত্ করে সিন্ধুজলে জন্ম তার,
সাগর সেঁচে আনৃব তারে আনৃব ঘরে পুনর্ব্বার ;
আনৃব ঘরে মাথায় ক'রে বিদ্যা মৃত-সঞ্জীবন,
শুক্র ঋষির চরণ-ধূলায় পরব মোরা জ্ঞানাঞ্জন ।

দেবযানীরে রাখ্‌ব খুসী ব্রহ্মচর্য্য ছাড়ব না,
আপনজনে ভুল্‌ব না রে পরের আদর কাড়ব না ;
জালের কাঁঠি নিরেট খাঁটি, ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকার,—
মিল্‌লে নিধি, জলের তলে থাক্‌বে না সে ছড়িয়ে আর ;—

ঘেঁষে ঘেঁষে ঘনিয়ে এসে মিলিয়ে দেবে সকল খুঁট,—
ধন ঘড়াটি ধরবে আঁটি' লাখ্ আঙুলের লোহার মুঠ !
ছড়িয়ে গিয়ে জগৎমাঝে মিল্‌ব মোরা অন্তরে ;
নূতন ক'রে পড়ব বাঁধা দেশের মায়া-মন্তরে ।

পাঁজি পুথি রইল মাথায়, জ্ঞানের বাড়া নেইক বল,
যৌবনের এই শুভক্ষণে বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
হিন্দু যখন সিন্ধুপারে করলে দখল যবদ্বীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?

কোথায় ছিল জাতির তর্ক—অর্কফলার আন্দোলন—
যেদিন রুদ্র সমুদ্রেরে বিজয় দিল আলিঙ্গন ?
মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মঠপ্রতিষ্ঠা রামসীতার—
বিধান দিল কোন্ মনীষি ?—খোঁজ রাখে কি পুরাণ তার ?

উডুপ-যোগে দু'দিন আগে হিন্দু যেত সিন্ধু পার,
মিশর, পেরু, রোম, জাপানে ছুট্‌ত নিয়ে পণ্যভার ;
তাদের ধারা লুপ্ত হবে ? থাক্‌বে শুধু পঞ্জিকা ?
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হ'ল গঞ্জিকা ?

করুক তবে সূক্ষ্ম বিচার শাস্ত্র নিয়ে পণ্ডিতে ;
নিঃস্ব করুক নস্য-ধানী গোময়-লিপ্ত গণ্ডীতে।
চল্‌বে না কেউ মোদের নিয়ে ?—সাগরের তো চল্‌ছে জল ;
পরের কথা ভাব্‌ব পরে—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।

কাঁটা ঝাঁপ

কাঁটা ঝাঁপের বাজ্‌না বাজে, ঢাকের পিঠে পাখ্‌না দোলে,
মহেশ্বরে স্মরণ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ কাঁটার কোলে।
দৃষ্টি রাখিস্‌ শিবের পায়ে, চাস্‌ নেরে আর নিজের প্রতি,
কাঁটার জ্বালা ভোলায় ভোলা, ভুলিস্‌নে তা' ব্রতের ব্রতী।
দেব্‌তা মানুষ সবাই মিলে তোর পানে আজ আছে চেয়ে,
মঞ্চে উঠে ডরাস্‌ নে মন ! পিছাস্‌নে রে সাম্‌নে ধেয়ে।
সংসারী তুই সন্ন্যাসী আজ শিবের শুভ প্রসাদ লাগি',
শিবের পায়ে হৃদয় সঁপে পালিয়ে হবি পাপের ভাগী ?
আগুন লুফে কাঁটায় শুয়ে দিন কটা তুই কাটিয়ে দেরে,
শিবের দোহাই পিছাস্‌ নে ভাই পরীক্ষাতে যাস্‌নে হেরে।
ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ কাঁটার বুকে উল্লাসে প্রাণ উঠুক মেতে,
কাঁটা সে হয় কুসুম-শয্যা মহেশ্বরের কটাক্ষেতে।
কাঁটা তো নয় কেবল কঠোর,—রুদ্র শিবের অঙ্গুলি ও,—
কোল যে দিতে পারে কাঁটায় সেই মহেশের হয় রে প্রিয়।
জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন সকল কালে সকল কাজে ;
শঙ্কা কি তোর ? ঝাঁপ দিয়ে পড়, দেখ্‌রে তাঁরে নিজের মাঝে।

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি !
চন্দনেরি গন্ধভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা.—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি !
শিয়রে তার সূর্য্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি !
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল্ দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।
মউল্ ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আটটি শীষে বাঁধা আটি।

সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি

নিবেদিতা

প্রসুতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;—
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
বিদেশিনী নিবেদিতা ! স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ তেয়াগি'
দীন দেশে ছিলে দীন ভাবে ; দুঃস্থ এ বঙ্গের লাগি'

সঁপেছিলে সর্ব্বধন,—কায়, মন, বচন আপন,—
ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্ম-নিবেদন।
ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হ'তে,
দিয়েছিলে স্নিগ্ধ ক'রে অনাবিল মমত্বের স্রোতে।

তপস্যার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণ দীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির ;—
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর।

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈল মূলে ;—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী !

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চ'লে যাই, ভাই,
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
দেখিবে সে নাই।
তোমরা খুঁজিবে কিনা জানিনা ; সকলে
চাহিয়াছি আমি ;
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের
ছিনু অনুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ বিবাদ,
আজ ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে বহুবার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি,
আজ ক্ষমা চাই ;
স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—
আমি জানি, ভাই।
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চির জনমের,
উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
চিহ্ন মরমের।

খেলাধুলা কতমত অশ্রুভরা স্মৃতি
সারা জীবনের
মেলামেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,
আনন্দ মনের,—
যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
রবে সে তেমনি,
যা কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
অমূল্য সে গণি।
মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
ভুলিব না, হায়!
তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
বিদায়! বিদায়!

সফল অশ্রু

নয়নের জল সফল হ'য়েছে
প্রভু হে তোমার চরণ ছুঁয়ে;
বর্ষা-যামিনী কেঁদেছিল, তাই
মলিনতা তার গিয়েছে ধুয়ে!
সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না,
বজ্র জ্বালিয়া করিলে আলো,
শুষ্ক আমার শূন্য হৃদয়
অশ্রু সলিলে ভরিলে ভালো।
অবিরল ধার করুণা তোমার
প্রভু হে দিয়েছ লুটায়ে ভুঁয়ে,
ভাবনার আজি অন্ত পেয়েছি
পরাণের ভার চরণে থুয়ে।

নষ্টোদ্ধার

আমরা এবার মন করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে,
যাচ্ছি সাগর—ভরা ডুবির
ধনের ঘড়া খুল্‌তে !
মোহরভরা ধনের ঘড়ায়
যদিই লোণা জল ঢুকে যায়—
সোনা তবু সোনাই থাকে
পারি নে সে ভুল্‌তে ;
আমরা এবার পণ করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে !

মন ক'রেছি আমরা ক'জন
নষ্ট মানুষ তুল্‌তে,
পঙ্কে আছি নাব্‌তে রাজী
মনের চাবি খুল্‌তে !
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে-
মজিয়ে থাকে মগজটাকে—
মানুষ তবু মানুষ, ওগো
পারব না তা' ভুল্‌তে,
মন ক'রেছি—পণ করেছি
হারা হৃদয় তুল্‌তে।

উছল ঢেউয়ের পিছ্‌লা পিঠে
হবে রে আজ দুল্‌তে,
ক্ষতির খাতায় পড়বে না সব,—
পারিস্‌ যদি উল্‌তে ;
জাহাজীরা যাদের মানে
—হাজা-মজার হিসাব জানে-
তারা তো কেউ দেখায় না ভয়,—
দিচ্ছে সাহস উল্‌টে ;
আয় তবে আয়, চল্‌ দরিয়ার
ওলোন্‌ ঝোলার ঝুল্‌তে।

লোণা জলে রেশম পশম
আর দেওয়া নয় ফুল্‌তে,
আর দেওয়া নয় পতিত্‌ জনে
পাপের নেশায় ঢুল্‌তে ;
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে,-
আমরা শোধন করব তাকে,
করতে হবে নূতন বোধন
জাগিয়ে তারে তুল্‌তে,
মানুষ—দোষে গুণেই মানুষ,—
পারব না সে ভুল্‌তে।

প্রার্থনা

ধরম ব'লে যা মরম জেনেছে
সেই সে করম করিতে দাও,
পরম শরণ! অভয় চরণ
কম্পিত করে ধরিতে দাও।
হৃদয়ে আমার জ্বাল প্রভু জ্বাল,
তোমার করুণ নয়নেরি আলো,
তোমারি প্রসাদ জনমে মরণে
নিত্য নিয়ত বরিতে দাও।
স্তব্ধ করিয়া দাও হে আমার
লুব্ধ মনের চির হাহাকার,
শান্তি-শীতল তব পারাবারে
শূন্য জীবন ভরিতে দাও।
সূর্য্য না ওঠে তুমি জেগে রবে,—
বন্ধু না জোটে তুমি ডেকে লবে,-
এই আশাবাণী অন্তরে মানি'
অকূল পাথারে তরিতে দাও।

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,—
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া সম যার
আদরে ও অনাদরে,—
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
আপনি স্বয়ম্বরে,—
কৌস্তুভ আর বন-ফুল-হার
সমতুল প্রেমে যার,—
যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,—
চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে জন বুকে,—
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে,—
অনুখন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি',—
তাহারে নমস্কার।

দেব-দর্শন

অর্দ্ধ-উদয় দেখেছি তোমার
দেখেছি উদয়-সাগর-কূলে,
ওগো সুমহান্ ! ওগো শুভ ! মোর
আধেক বাঁধন গিয়েছে খুলে।

দেখেছি তোমার সহস্র বাহু
অযুত শীর্ষ দেখেছি চোখে,
যন্ত্রীর বেশ দেখেছি তোমার,—
সুনিয়ন্ত্রিত করিছ লোকে।

অপ্রমত্ত অযুত হস্ত
দেখেছি,—দেখেছি তড়িৎ আঁখি,
শুনেছি তোমার অভয় বচন,
অন্তরে ছবি গিয়েছে আঁকি'।

একের মধ্যে দেখেছি অনেকে,
বহুর মধ্যে দেখেছি একে ;
শঙ্কা-হরণ শঙ্কর তুমি,
বিমোহিত মন মূরতি দেখে।

বিজলী-ঝলকে দেখেছি পলকে
জীবনে কখনো দেখিনি যাহা,—
সঙ্কেতে বাঁধ সাগরের ঢেউ,
ইঙ্গিতে গিরি হেলাও, আহা !

আঁধারে আলোকে দেখেছি পুলকে
আঁখির পলকে দেখেছি আধা,
উদ্যত তব সহস্র বাহু
নিয়মের রাখী-সূত্রে বাঁধা।

সংযত তুমি, সংহত তুমি,
তুমি সুবিপুল শকতি-রাশি,
ওগো সুবিরাট! ওগো সম্রাট!
অতুলন তব অভয় হাসি!

অর্দ্ধ-উদয়ে দেখেছি তোমায়,
পূর্ণোদয়ের পেয়েছি আশা;
ওগো প্রিয়! ওগো কাঙ্ক্ষিত!—মোর
মরণ-জয়ের পড়েছে পাশা।

পরিশিষ্ট

অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বিরচিত

(১)

কবির পরিচয়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ১২৮৮ সালের ৩০এ মাঘ শনিবার কলিকাতার সন্নিহিত নিমতা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রজনীনাথ, মাতা মহামায়া দেবী। কবির পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। কবি তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা ও সাহিত্যের রসজ্ঞতা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়া অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবধি বিদ্যানুরাগী ও কবিতা-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকালের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' নামক পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম ছাপা হয়। 'সবিতা' তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। ইংরেজী ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধিক্ষণ' নামে একটি স্বদেশ-প্রেম-মূলক কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থ-রেণু', 'ফুলের ফসল', 'জন্মদুঃখী', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণিমঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', 'রঙ্গমল্লী', 'চীনের ধূপ' পর্য্যায়ক্রমে প্রায় প্রতি বৎসরে একখানি করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'বেলাশেষের গান', 'বিদায়-আরতি', 'ধূপের ধোঁয়া' এবং 'কাব্য-সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হয়। গদ্য ও পদ্য বহু রচনা এখনও সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে ৪০ বৎসর বয়সে কবির মৃত্যু হয়।

সত্যেন্দ্রের প্রকৃতি মধুর ও নীরব ছিল। তিনি অল্পভাষী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ, স্বদেশপ্রেমী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও মাতৃভক্তি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বন্ধুবৎসলতা অসাধারণ ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে ভাষার কারচুপি ও নানা বিদ্যার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইতিহাসের ও পুরাণের খুঁটিনাটি তথ্য তাঁহার এত জানা ছিল যে তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহার রচনার মধ্যে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ও আভাস গ্রথিত করিয়া দিতে পারিতেন।

আর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতী, নানাবিধ ছন্দ রচনায় ও উদ্‌ভাবনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবায় একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল। সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভাষায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অতি উচ্চ সূক্ষ্ম কল্পনা অথবা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনো দূরে সরিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ছন্দ-সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বন্দনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর-একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি খাঁটি বাংলা বুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাঁহার রচনার মধ্যে দিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সেই বাংলাদেশের নিজস্ব বাগ্‌ধারাকে ও সেই ভাষার ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দ-ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিয়া নূতন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্ত্তি। খাঁটি বাংলা ভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্ত্তমানের যাহা কিছু অধর্ম্ম

ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত আবার অতীত ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু মহান ও সুন্দর, ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিত, এবং তাঁহার বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়াও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দ্দশা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্য-সাধারণ নিপুণতা ছিল। এইরূপে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহাদের অন্তরালে কবির হৃদয়-বেদনা অথবা আনন্দ ও আশা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দরদী সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা একটু অনুধাবন করিলে ইহার পরিচয় পাইবেন।

এমন কবির অকাল তিরোধানে বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা কবি কীট্‌সের অকাল বিয়োগের ন্যায় চিরকাল কাব্য-রসিকদের দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিবে।

টীকা-টিপ্পনী

(২)

কুহু ও কেকা

কোকিল বসন্ত-দূত। সে তাহার মোহন গানে বসন্তকে পথ ভুলাইয়া ধরাধামে লইয়া আসে। এবং বসন্তের আগমন শীতের কোয়াসা-ঢাকা আকাশে বিচিত্র রং ফুটিয়া উঠে, এবং রিক্ত-শাখা তরুলতা পুষ্প-মঞ্জরীতে বিভূষিত হয়।

প্রতি তরু-লতার অন্তরে যে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধ গোপন থাকে, কুহুস্বরের গায়ক বসন্ত-সখা কোকিলের মোহন মন্ত্রে সেই সাধ নব কিশলয় ও পুষ্প-মুকুলের রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে, এবং শীতের প্রভাব শিথিল হইয়া আসে।

ময়ূরের কেকা-ধ্বনির মধ্যে সমস্ত বর্ষার ভাবটি যেন বন্দী হইয়া আছে। তাই নববর্ষার আগমনের আভাস পাইয়াই যখন ময়ূর কেকা-ধ্বনি করে, তখনই বর্ষার প্রধান ফুল কদম ফুটিয়া উঠে, এবং ময়ূর কলাপ মেলিয়া যখন নৃত্য করে তখন তাহার সেই উজ্জ্বল পেখমের উপর রৌদ্রের ঝিলিমিলি খেলা করিতে থাকে।

গ্রীষ্মের দাবদাহে দগ্ধ দেশে বর্ষাধারাকে আবাহন করিয়া আনিবার জন্ত ময়ূর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাহিয়া নৃত্য করিতে থাকে। মেঘমালা ধূম্রবর্ণ সর্পের মতন আকাশে সঞ্চরণ করে। এবং ময়ূরের কেকাধ্বনিতেই যেন মুগ্ধ হইয়া মেঘ হইতে জলধারা প্রবর্ষিত হইতে থাকে। সেই জলধারা যেন পরীক্ষিৎ-তনয় রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে আহুত শত শত সর্পের মতন বর্ষিত হইয়া প্রতপ্ত পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করে।

বহিঃপ্রকৃতিতে কুহু ও কেকা ঋতু-পর্য্যায়ের দুই প্রধান ঋতুতে জগতে আনন্দ বিতরণ করিয়া দেয়,—বসন্তের আগমনে শীতের প্রকোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষ আনন্দিত হয়, আবার বর্ষার আগমনে গ্রীষ্মের দাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মানুষ আনন্দিত হয়। এই দুই স্বর-লহরী যেন সন্তপ্ত পৃথিবীকে সুধাসিক্ত করিয়া প্রেয় পানীয় সোম পান করায়, এবং বিশ্ব-যজ্ঞে এই দুই স্বর অনাদি কাল হইতে দেবতার বন্দনায় ও আহ্বানে যাজ্ঞিকের সামগান ও ঋক্‌সূক্তের স্তায় উদ্গীত হইয়া আসিতেছে।

যেমন বাহ্যপ্রকৃতিতে কুহু ও কেকা আছে, তেমনই মানসলোকেও ঐরূপ

আনন্দ-বিষাদের লীলা-পর্য্যায়ে নিরন্তর চলিতেছে। বিশ্বব্যাপারের সমস্ত অনুভূতি কবি-মানসকে স্পর্শ করে, এবং পর্য্যায়ক্রমে হর্ষে ও বিষাদে অভিভূত করে।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির মনে যেমন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিচ্ছেদে শোক হইতে শ্লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল, তেমনি জগতের সমস্ত গোপন ব্যথা কবি-মানসে গিয়া প্রতিভাত হয়, এবং কবি তাহা অপূর্ব্ব সুরে প্রকাশ করিয়া মানব-মন হরণ করেন।

মানব-মনের এই যে হাসি-কান্নার লীলা, এই যে প্রকাশের আকূতি-ভরা হর্ষ-বিষাদ, ইহা প্রকাশ করিবেন একমাত্র কবি। "লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কহিবে, সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।" কবির এই কাজ। কবি তো বিশ্বমানবের মুখপাত্র, মনের গোপন রহস্যের ভাণ্ডারী। কবি সেই রহস্য প্রকাশ করিয়া তুলেন ফুলের মতন, প্রচার করেন হাওয়ার মতন, এবং সর্পের ন্যায় খল স্বভাব সকল নিন্দুককে হিংসুককে তিনি বশ করিয়া ফেলেন।

কিন্তু মানস-মুকুল অতি সুকোমল, প্রকাশ-ভীরু। ফুটিয়া উঠিবার আগেই যাহা ঝরিয়া যাইতে চায়, তাহারই মালা গাঁথিতে চাহেন কবি। এ যেন স্বর্ণনদী-প্রসবী সুবর্ণময় সুমেরুচূড়া উল্লঙ্ঘন করিবার বাসনা, যে সুমেরু-চূড়া সূর্য্যও উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। হাজার-তারা মানস-বীণায় যে অদ্ভুত স্বরমূর্চ্ছনা নিত্য নিরন্তর ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহাই শিখিয়া প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা করেন কবি।

বহিঃপ্রকৃতিতে যখন কোকিলের কুহুরব ধ্বনিত হয় তখন বাসন্তী জ্যোৎস্নায় দিক্ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে, তখন আকাশ নির্ম্মল প্রসন্ন। আবার যখন বর্ষার নকিব ময়ূর কেকা-রব করে তখন কেবল মেঘাড়ম্বরে আকাশ আচ্ছন্ন থাকে তখন আর জ্যোৎস্না বিকশিত হইবার অবকাশ পায় না। কিন্তু কবি বিশ্বপ্রকৃতির এই অভাব তাঁহার যাদুমন্ত্রে, তাঁহার ধ্যানের বলে মোচন করিয়া মেঘের কোলেই জ্যোৎস্না বিকশিত করিয়া তুলিতে সক্ষম, মিলন ও বিচ্ছেদ, প্রীতি ও স্মৃতি তাঁহার মোহন মন্ত্রে এক সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে। কবির "হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে"।

মদন-মহোৎসবে—৫ পৃষ্ঠা

প্রাচীন ভারতে বসন্ত কালে মদন মহোৎসব হইত। শীতান্তে নববসন্তের অভ্যাগমে নর-নারীর মন মিলনানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। বসন্তকালে পদ্মফুল অশোকফুল আম্রমুকুল নবমল্লিকা এবং নীলোৎপল ফুটিয়া নর-নারীর মনকে মুগ্ধ, প্রিয়-মিলনে ব্যগ্র করিয়া তুলে; তাই ঐ পাঁচটি ফুলকে কবিরা মদনের পঞ্চবাণ বলিয়াছেন।

আমাদের কবি ঋতুরাজ বিশ্বেশ্বরের নিকটে সেই পাঁচটি ফুলের অনুরূপ পাঁচটি গুণ বর প্রার্থনা করিতেছেন। কবি প্রথমেই অশোকফুলের মতন রূপ চাহিতেছেন, কারণ মানুষ "চোখের দাবী মিট্‌লে পরে তখন খোঁজে মন।" হিন্দীতে একটা কথা আছে 'পহিলে দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারী।' মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন যে—'আকৃতি-বিশেষে আদরঃপদং করোতি—বিশেষ আকৃতি দেখিয়াই আদর তাহার উপর পদনিক্ষেপ করে।' —মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক। কবিশেখর রবীন্দ্রনাথও এই কথা বহু স্থানে বলিয়াছেন। তুলনীয়—'গুপ্তপ্রেম'—মানসী, চিত্রাঙ্গদা নাটিকা, শাপমোচন। কবি সত্যেন্দ্রনাথও তাঁহার প্রথম কাব্য 'বেণু ও বীণা'র মধ্যে 'রূপ ও প্রেম' কবিতায় বলিয়াছেন—"রূপ তো হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা!"

সদা-হাস্যবদন মল্লিকাফুলের মতন মনের ক্ষুধা মিটাইবার মনোহরণ বিদ্যা কবি প্রার্থনা করিতেছেন।

তার পরে প্রার্থনা করিতেছেন আম্রমুকুলের মধ্যে যেমন ভবিষ্যৎ ফলের সম্ভাবনা লুক্কায়িত থাকে, তেমনি প্রেমের মিলনে প্রাথমিক দৈহিক মোহ কাটিয়া গেলেও যেন প্রাণের পরিচয়ে সেই প্রেম প্রগাঢ়তর হইয়া উঠে। তুলনীয়—চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন।

কবি নীলোৎপলের ন্যায় রূপ স্বভাব মাধুর্য্য কামনা করেন। ইহার দ্বারা তিনি সকলের চোখের মনের ও প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে পারিবেন।

তরুণ কবির অরুণবর্ণ অরবিন্দ তুল্য হৃদয় বিশ্বেশ্বরের নিকটে পঞ্চফুলের রূপ গুণ বর প্রার্থনা করিয়াছে।

মধুমাসে—৬

শেষ দুই লাইনে কবি বলিতেছেন যে মধুময় বসন্তের আগমনে পুলক-হাসির পাগল করা বাঁশীর সুর মৌন গোপন দুঃখকে দূর করিয়া মন আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিল।

গান—৬ পৃষ্ঠা

৬ পৃষ্ঠা—দুখের আপন সে বুল্‌বুল—ফার্সী কবিরা মনে করেন—বুল্‌বুল গোলাপের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গোলাপের কাঁটায় বুক বিদ্ধ করিয়া করুণ সুরে বিলাপ করে, সে হাজার রকমে বিলাপ করে বলিয়া তাহার এক নাম 'হাজার দাস্তা'। হাফিজের কবিতায় আছে—'কণ্টকে গোলাপ ফোটে, প্রেমের সাথী বুল্‌বুলি।' ডাঃ শহীদুল্লাহ-কৃত অনুবাদ।

-(৭ পৃষ্ঠা) কবিতাটি নারীর উক্তি।

চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা—৮ পৃষ্ঠা

চার্ব্বাক প্রাচীন ভারতের নাস্তিক দার্শনিক। চার্ব্বাক-মতের উল্লেখ মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। কবি অনুমান করিয়াছেন যে চার্ব্বাক চিরকালই নাস্তিক ছিলেন না, তিনি প্রণয়ে হতাশ হইয়াই বিধাতার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

চার্ব্বাক নামের ব্যুৎপত্তি হইতেছে চারুবাক্, যিনি মিষ্টভাষী। তাই কবি কল্পনা করিয়াছেন যে চারুবাক্ চার্ব্বাকের প্রণয়িনীর নাম ছিল মঞ্জুভাষা অর্থাৎ সুমধুরভাষিণী।

এই কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। এই কবিতার ঘটনা কল্পনা যেমন মনোহারিণী, ইহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য-কল্পনাও তেমনি। চার্ব্বাক ঋষির তপোবনে মরালী ও মরাল মিলন-সুখে মগ্ন, সমস্ত বনস্থলীটি যেন একটি মধুচক্র, দেবদারু তরুর ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যরশ্মি বনভূমিতে ঝরিয়া পড়িতেছে যেন মধুক্ষরণ হইতেছে। সেই পথ দিয়া চার্ব্বাক চলিয়াছেন, তাঁহার মনের মধ্যে কত গোপন চিন্তা তোলাপাড়া করিতেছে, যেমন শীতকালের মুদিত পদ্মের হৃদয়কোষে বন্দী গন্ধ প্রকাশের জন্য আকুলিবিকুলি করে।

৯ পৃষ্ঠা—পিতা কবে সন্তানে কাঁদায় ইত্যাদি—তুলনীয় বাইবেলে ভগবান

যিশুর উক্তি—**What man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?......St. Matthew,7. 9.**

যোরা যে বিশ্বের পরমাণু ইত্যাদি—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'চিরদিন' কবিতা (কড়ি ও কোমল)—"বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার!"

১০ পৃষ্ঠা—যুখে বলো পুত্র অমৃতের! —তুলনীয়—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ২।৫।

লোহ—অশ্রু। লক্ষণীয় লোহ ও লৌহ শব্দ দুটির প্রয়োগ।

মরণের পরে কিবা আর?—চার্ব্বাকের এই সন্দেহ পরে তাঁহার মতবাদে দৃঢ় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?'

১১ পৃষ্ঠা—লতিকার তন্তু—লতার আঁকড়া, tendril.

মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার—মঞ্জুভাষার চোখদুটি দেবতার আরতি প্রদীপের ন্যায় পবিত্র, সকলের মঙ্গলপ্রদ।

পরিপূর সংযত পুলকে—মঞ্জুভাষার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহার উল্লাস মনের গোপনে সুসংযত হইয়া রহিয়াছে।

পুষ্প মহুয়ার—মহুয়া যেমন মাদক, তেমনি তাহার কপোল-যুগল মাদক ও নিটোল।

বাহুলতা চন্দনের শাখা—শ্বেতচন্দনের শাখার ন্যায় তাহার বাহু দুটি সুবলিত লীলায়িত মসৃণ ও শুভ্র।

১২ পৃষ্ঠা—আমি মা হবো তাহার—তোমার পোষ্যপুত্র হরিণশিশুর মাতার স্থান আমি গ্রহণ করিব। ইহার মধ্যে এই ধ্বনি ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে আমি তোমার পুত্রের জননী হইতে স্বীকার করিতেছি।

আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহধার দিয়ো তুমি—আমার স্নেহপাত্রে তোমার স্নেহধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া আমাদের উভয়ের মিলনের সঙ্গমক্ষেত্র হইবে।

ভাষাহীন আশার আবেশে সুখভরে চুমে মৃগটিরে—চার্ব্বাকের মনে এই আশা জাগিয়াছে যে হয়তো মঞ্জুভাষা তাহার গৃহিণী হইয়া তাহাকে চরিতার্থ করিবে। কিন্তু এই আশা তাহার মনে গুপ্ত হইয়া আছে, তাহা সে ভাষায়

প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, এবং এই আশা সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে এই মৃগশিশুটীর প্রতি মঞ্জুভাষার মমতায়, তাই চার্ব্বাক মৃগটিকে চুম্বন করিয়া মঞ্জুভাষাকে চুম্বনের আনন্দ অনুভব করিয়া লইতেছে।

বোঝা সোজা হলো—জগতের সমস্ত রহস্য সহজে যেন বোধগম্য হইয়া আসিতে লাগিল।

চার্ব্বাক মঞ্জুভাষার মমতার একটু পরিচয় পাইয়াই মনে করিতেছে যে পরমেশ্বর দয়ার ঠাকুর। সে এতদিন নির্গুণ অনাসক্ত ব্রহ্ম-সত্তাতে সন্দিহান ছিল; কিন্তু আজ মঞ্জুভাষার প্রেম লাভ করিবার সম্ভাবনাতেই তাহার মনে যে আনন্দ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতেই সে মনে করিতেছে এই আনন্দের আদি প্রস্রবণ-স্বরূপ আনন্দময় ভগবান প্রেমময়, তিনি নির্গুণ নির্ব্বিকল্প অনাসক্ত নহেন।

সহজিয়া—১৪ পৃষ্ঠা

বুদ্ধদেবের প্রচারিত সদ্ধর্ম্ম কালক্রমে হীনযান ও মহাযান এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাহার পরে আবার মহাযান বহু শাখায় বিভক্ত হয়, তাহাদের মধ্যে মন্ত্রযান বজ্রযান ও সহজযান প্রধান। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে রাঢ় দেশের লুইপাদ সহজ-যান প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পরে ১০ম শতাব্দীতে নাড়-পণ্ডিত সহজ-মত প্রচার করেন। এই মতাবলম্বীরা বলিতেন যে জীবনের প্রকাশের জন্য একটি মুক্ত অবকাশ চাই। জীবনাধার পরব্রহ্ম তাই আপনাকে মুক্ত অবকাশ শূন্যরূপ করিয়াছেন। তাহাই সহজ। সর্ব্বস্থানে বিরাজমান সেই সহজ শূন্য। সেই সহজশূন্য সরোবরের তীরে আত্মা-হংস নিত্যকেলি ও আনন্দ-কল্লোল করে। এই সহজ শূন্য একটি আধ্যাত্মিক ভাবাবস্থিতি। এই অবস্থায় সাধক সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আনন্দ পরিপূর্ণ দেখেন। সহজ পথের পথিকের লক্ষণ হইল আপনার সম্বন্ধে অচেতন থাকা। জীবনের বিকাশের পক্ষে আকার-বিশিষ্ট স্থূল বস্তু বাধা-স্বরূপ। সকল ভেদের সমন্বয় করাই হইল সাধনার সহজ ভাব। এই ভাব প্রাপ্ত হইলে সুখ-দুঃখ আত্ম-পর গ্রহণ-বর্জ্জন সব সহজ হইয়া এক হইয়া যায়। এই পরিপূর্ণতার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়াই মুক্তি। সহজ পথের সাধক সহজিয়ারা বলেন

—এই জীবনের মধ্যেই সব পাওয়া যায়; তবে আর বাহিরে যাওয়া কেন? যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। সহজ সুন্দরের মধ্যে নিত্য-বসন্ত। প্রীতি বা প্রেম-মার্গ অনুসরণ করিয়া সহজিয়ারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করেন। ইহাই তাঁহাদের সাধনার অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। সহজিয়া মতে রূপ প্রেম ও আনন্দ সম-অনুভূতি-সাপেক্ষ এবং পরস্পর নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রেমের গণ্ডীর মধ্যে রসের অবস্থিতি। তাহা হইতে রূপের উৎপত্তি, আনন্দও তাহা হইতে উৎপন্ন। সহজিয়ারা রসকে অবলম্বন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন বলিয়া তাঁহারা 'রসিক' নামে পরিচিত। তাঁহারা রূপধর্ম্মী ও বটেন, এজন্য সহজ-মর্ম্মের অপর নাম 'রূপধর্ম্ম'। প্রকৃত রসিক না হইলে রূপের সত্তা অনুভব করা যায় না, এবং আনন্দেরও অনুভব হয় না। রসিক সীমা-বিশিষ্ট রূপের সাধনার দ্বারা অরূপের অনুভূতি হৃদয়ে জাগরিত করেন। পুরুষের মন সহজেই রমণী-রূপে আকৃষ্ট হয়। অতএব ইহারা সুন্দরী রমণীকে ভালবাসিয়া পরমসুন্দর আনন্দময় রস-স্বরূপকে ভালোবাসিবার সাধনা করেন। সহজ ধর্ম্মে স্বকীয়া হইতে পরকীয়া নায়িকা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা স্বকীয়া অর্থে সকাম-সাধনা এবং পরকীয়া অর্থে নিষ্কাম-সাধনা বুঝিয়া থাকেন। পরকীয়া নায়িকাকে কেমন ভাবে ভালবাসিতে হইবে সে সম্বন্ধে রসিক কবি চণ্ডীদাস বলিয়া গিয়াছেন—

রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
দোঁহার পীরিতি নিক্তির কাঁটা।
রতি-কাম তাথে লাগয়ে বাটা॥
রতি-কাম যদি কিঞ্চিৎ টলে।
সহজ বলিয়া কেমনে বলে॥
তোরা সিনান করিবি, নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের দেহা।

আমাদের কবি সত্যেন্দ্রনাথও এইরূপ ভাবিনী ভাবের দেহাকে ভালোবাসিতে চাহিতেছেন। তিনি অতনুর অতল ভাব মাত্র অনুভব করিতে চাহেন। তিনি বলিতেছেন যে যেমন ফুলকে দূর হইতে রসিক লোকে

প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়াই আনন্দিত হয়, তেমনি তিনি রূপসীর অরূপ আবির্ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে চাহেন। তাঁহার এই সহজিয়া প্রেম-সাধনা কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক রসানুভূতি, ধ্যান দ্বারা রূপের আনন্দ সম্ভোগ। এইরূপ প্রেমের কথা ফার্সী কবি হাফিজের কবিতাতেও আছে—

আয়না তোমার আত্মার গো—তরল তোমার ঐ লাবণি!
সাধ জাগে ঐ ধ্যানের চরণ করি আমার নয়ন-মণি।
না না, আমার ভয় করে গো, নয়ন-পাতার কাঁটায় পাছে
কমল-পায়ে বাজে ব্যথা!—ধেয়ানে থাকো সারাক্ষণই!
—কাজি নজরুল ইস্‌লামের অনুবাদ।

লীলার ছল—(১৫ পৃষ্ঠা) কবিতাটি পুরুষের উক্তি।

লব্ধ-দুর্লভ—১৬ পৃষ্ঠা

কবি যাহাকে লাভ করিয়াও লাভ করিতে পারিতেছেন না, সেই তাঁহার লব্ধ-দুর্লভ কে? ইনি কবির মানস-সুন্দরী হইতে পারেন, অথবা কবিতাসুন্দরী অথবা কবি-প্রিয়া হইতেও পারেন।

১৬ পৃষ্ঠা—মলিন ধূলির কোলে ইত্যাদি—যদিও তুমি পার্থিব সৌন্দর্য্যে পরিব্যাপ্ত, সাংসারিকতার মধ্যে নিমজ্জিত, তথাপি তুমি অমলিন, পার্থিবতা পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তোমাকে স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করিতে পারে না।

১৭ পৃষ্ঠা—ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে ইত্যাদি—এইরূপ উক্তি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব-রূপে অবতার হইয়াছিলেন এই তিনটি বিষয় জানিবার জন্য—১। রাধার প্রেমের মহিমা কি প্রকার? ২। কৃষ্ণের প্রতি যে-প্রণয় দ্বারা রাধা কৃষ্ণের মধুরিমা আস্বাদন করেন, কৃষ্ণের সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার? ৩। কৃষ্ণকে অনুভব করিয়া রাধার যে সুখাতিশয় হয়, তাহাই বা কি প্রকার?

দুখের গদ্‌গদ সুখ, সুখের বেদনা—প্রেমে প্রিয়কে পাইয়াও মনে হয় যে

সম্পূর্ণ রূপে পাই নাই, তাই 'হুঁহু কোরে হুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। এইরূপ প্রগাঢ় ভালবাসার মধ্যে একটি অসহ্য বেদনা আছে, কিন্তু সেই বেদনা অনুভব করার মধ্যে একটি আনন্দও আছে। আবার প্রিয়-মিলনের মধ্যেও যে আনন্দ তাহা এমন গভীর ও প্রবল যে তাহা মনে বহন করা অসম্ভব হইয়া উঠে, সেই অক্ষমতার জন্য একটি বেদনা-বোধও হইয়া থাকে।

পূর্ণা, রিক্তা—পঞ্জিকার মধ্যে পঞ্চদশ তিথিকে পাঁচটি ভাগে পাঁচটি নাম দেওয়া হইয়াছে—পূর্ণা রিক্তা জয়া ভদ্রা নন্দা।

তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী' কবিতা

১৮ পৃষ্ঠা—শিয়রে সোনার কাঠি ইত্যাদি—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কবিতা।

মূর্চ্ছিত বৈশাখে—গ্রীষ্ম-তাপ-সন্তপ্ত বৈশাখে।

মর্ত্তে এলে মূর্ত্তি ধ'রে আমারি দুয়ারে—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী'

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার;..................

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা?............
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি!

তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক'—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট!

প্রিয়-প্রদক্ষিণ—১৯ পৃষ্ঠা

১৯ পৃষ্ঠা—প্রিয়ার ও-তনু অতনু সে কোন্ দেবতার মন্দির!—প্রেমের মূলে থাকে দেহ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা। তখন মদনকে বলিতে হয়—"একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে নব ভুবনে!" কিন্তু সেই প্রাথমিক প্রেম

প্রগাঢ় হইলে তখন মদন অনঙ্গ হইয়া পড়েন, তখন আর দেহাকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে না, তখন প্রিয়ার তনুকে কোনো অতনু দেবতার মন্দিরের ন্যায় পরম পবিত্র মনে হয়।

তাম্রনখে—তাম্র-বর্ণ ঈষৎ আরক্ত নখে।

জড়ুল—গায়ের তিল অপেক্ষা বড় কৃষ্ণ-চিহ্ন।

নির্ম্মালি—এক রকমের ফল, তাহা ঘোলা জলে ডুবাইয়া বুলাইয়া' দিলে জল পরিষ্কার হইয়া যায়, জলের সমস্ত মলা মাটি জলের তলে থিতাইয়া পড়ে। এই নির্ম্মালি শব্দটির মধ্যে দেব-পূজার অবশেষ প্রসাদী ফুল নির্ম্মাল্যেরও একটু ধ্বনি ও ইঙ্গিত আছে।

২০ পৃষ্ঠা—কত জনমের মূর্চ্ছনা তাতে ইত্যাদি—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতা এবং

তোমারেই যেন ভালো বাসিয়াছি
শতরূপে শতবার,
যুগে যুগে অনিবার!—অনন্ত প্রেম।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া!—উৎসর্গ ১৩ নম্বর।

নিবিড় পরশ—এই স্পর্শ অতনু-স্পর্শ, হৃদয়-পরাণেরা স্পর্শ, আঁখির দৃষ্টির স্পর্শ।

তুমি ও আমি—২১

এককালে আমরা উভয়ে ফুল ছিলাম। তখন তোমাতে আমাতে একই পুষ্প-দেহে সম্মিলিত হইয়া ছিলাম। তখন আমার পুংকেশরে ছিল সোনার রেণু, আর তোমার গর্ভকেশরে ছিল স্নিগ্ধ মধু। সেই উদ্‌ভিদ-জীবনের পরে কত কত যুগ-যুগান্তরের বিবর্ত্তনে আমরা জীব হইয়া মানুষ হইয়া জন্মিলাম, তখন আমাদের দেহ পৃথক হইয়া গিয়াছে। এই যে পার্থক্য, ইহা কেবল মিলনকে প্রগাঢ় ও সুমধুর করিবার জন্যই। তাই কবি বরদাচরণ মিত্র বিরহী যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

অন্তরিত তনু দুটি; কিন্তু দুটি মন—
অতিক্রমি' বাধা বিঘ্ন গিরি বন নদী—

হইয়াছে আঁখিনীরে সুদূরে মিলন,
স্বপ্ন-আলিঙ্গনে বাঁধা আছে নিরবধি !

....

বিরহ কি শুধু ব্যথা,—কেবলই বেদনা ?
না না কবি, তুমিই তো দিয়াছ বলিয়া,
শ্রান্ত মদনের সে যে আবেশ-স্বপন,—
জাগে রতিপতি বল দ্বিগুণ লভিয়া।

* * * * *

বেদনা তো বটে তায়,—কিন্তু কি মধুর !!

—মেঘদূত।

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রিতা' কাব্যের প্রথম কবিতা 'পুষ্প'।

গ্রীষ্ম-চিত্র—২২ পৃষ্ঠা

স্বয়ং কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দটির নাম রাখিয়াছিলেন 'বেদী-বিমধ্যক ছন্দ'। যজ্ঞবেদীর ন্যায় ইহার উপর ও নিম্ন দেশ স্থূল বিস্তৃত, এবং মধ্য-ভাগ ক্ষীণ।

অকারণ—২৩

২৫ পৃষ্ঠা—অকারণে হায় অশ্রু গড়ায়—তুলনীয়

আমাদের মাঝারে যে আছে, কে গো সে,
কোন্ বিরহিণী নারী ?

* * *

"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই,"
কহে বিরহিণী নারী।

* * *

"অজানারে কবে করিব আপন"—
কহে বিরহিণী নারী !

—রবীন্দ্রনাথ, উৎসর্গ, 'বিরহিণী' (১০ নম্বর কবিতা)।

পাল্কীর গান—২৬ পৃষ্ঠা

সত্যেন্দ্রনাথ জানিতেন যে বিশ্ব ছন্দে মুখর। প্রকৃতির রাজ্যে যত রকমের শব্দ হয়, তাহাদের সকলের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি বা মাত্রা বা তাল আছে। তাঁহার শ্রুতির সূক্ষ্ম সুরবোধ হইতে তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন যে মেঘের ডাকে, পাখীর গানে, তরু-মর্ম্মরে, ঝর্ণাধারায়, সমুদ্র-তরঙ্গে ছন্দ আছে। কবি সেই-সব ছন্দ কানে ধরিয়া সেই তালে শব্দ বিন্যাস করিয়া বহু নূতন ছন্দ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাল্কী-বেহারারা পাল্কী বহন করিবার সময়ে যে অব্যক্ত শব্দ করে, তাহার তাল ধরিয়া কবি এই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। যখন পাল্কী জোরে চলিয়াছে, তখন বেহারাদের ধ্বনির লয় দ্রুত; আবার যখন তাহারা কাঁধ বদল করিতেছে বা উঁচু নীচু পথে চলিতেছে বা তাহাদের ক্লান্ত গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছে, সেখানকার লয় অপেক্ষাকৃত ঢিমা। এই কবিতাটিতে গ্রাম্য ছবি বায়োস্কোপের চিত্র-পরম্পরার মতো পর পর চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

২৬ পৃষ্ঠা—আদুল—অনাবৃত।

২৯ পৃষ্ঠা—কাঁথ—মেটে ঘরের পোতা।

মটকা—খড়ো চালের চূড়া।

পোয়াল-গুচি—খড়ো চালে খড়ের বা বিচালির গুচ্ছ গুঁজিয়া চাল মেরামত করা হয়।

৩০ পৃষ্ঠা—হাতের পোঁছায়—হাতের মণিবন্ধ দ্বারা।

পুঁটে—সোনা বা রূপার পুষ্প-কলিকা-তুল্য অলঙ্কার।

৩১ পৃষ্ঠা—বুনোর ডেরায়—বাংলা দেশে যাযাবর সাঁওতাল বা বেদে জাতিদের বুনো বলে, তাহাদের অস্থায়ী আড্ডায়।

৩২ পৃষ্ঠা—তাতারসি—নূতন খেজুরের রস জ্বাল দিয়া অতি ঘন হইয়া উঠিয়া গুড় হইবার পূর্ব্বে ঈষৎ ঘন তপ্ত রসকে তাতারসি বলে।

বাঁধের দিকে—বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় এমন অনেক জমি দেখা যায় যাহার তিন দিক উচ্চ ও এক দিকে ঢালু। বর্ষার সময়ে সেই ঢালু দিক দিয়া জল আসিয়া সেই স্থানটিকে জলাশয়ে পরিণত করে। যদি সেই ঢালু

দিকে একটা মাটির পাড়ি উঁচু করিয়া বাঁধ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থানটি একটি পুষ্করিণীতে পরিণত হয়, তাহাতে বারো মাসই জল ধরিয়া রাখা চলে। এইরূপ জলাশয়কে বাঁধ বলে। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতা—বাঁধের জলরেখা অদূরে যায় দেখা ইত্যাদি।

সাড়ে চুয়াত্তর—৩৪

চিতোরের রাণা জয়মল্ল সম্রাট আকবরের হস্তে নিহত হন, এবং সেই যুদ্ধে এত রাজপুত যোদ্ধা নিহত হন যে তাঁহাদের পৈতার ওজন হয় ৭৪॥ মণ, এবং এত রাজপুত-রমণী জহরব্রত করিয়া আগুনে পুড়িয়া মরেন যে তাঁহাদের বস্ত্র-অলঙ্কারের ওজন হয় ৭৪॥০ মণ। সেই অবধি এই ৭৪॥০ সংখ্যাটি চিতোর-ধ্বংস এবং স্বদেশভক্ত বীর ও বীরনারী হত্যার দিব্যস্বরূপ হইয়া আছে।—টডের রাজস্থান, ১।১০।৩৪৩ পৃষ্ঠা।

নাগ-পঞ্চমী—৩৫ পৃষ্ঠা

অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ৩।৪।১ শ্রাবণ শুক্লা বা কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি নাগপঞ্চমী নামে চিহ্নিত।

৩৫ পৃষ্ঠা—গ্রন্থিল বাঁকা হিন্তাল-শাখা—মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ সদাগর মনসা দেবীকে মারিবার জন্য সর্ব্বদা হাতে হিমতাল বা হেমতালের লাঠি বহন করিতেন।

মৃত্যুরে পূজি অমরতা লাভ—তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-যাত্রী' ও 'মা ভৈঃ'।

গ্রীষ্মের সুর—৩৬

এই কবিতাটি ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগোর একটি কবিতার ছন্দের অনুকরণে বিরচিত।

৩৬ পৃষ্ঠা—মধু-মাধবের গান—মধু মাস ও মাধব মাস চৈত্র-বৈশাখ মাস।

অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ—অশোকের ফুল সব শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে, যেন পূজার অন্তে প্রসাদী ফুলের নির্ম্মাল্য।

নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া—হাওয়ার মধ্যেকার জলবাষ্প সমস্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

একচক্র রথের ঠাকুর—আর্য্যেরা মনে করিতেন যে আমরা যে সূর্য্য-মণ্ডল দেখি, সেই জড়পিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সরসিজাসনে সূর্য্যদেব বিরাজ করেন, এবং ঐ জ্যোতিঃপিণ্ড তাঁহার একচক্র রথ, উহাতে চড়িয়া তিনি দৈনিক পরিভ্রমণ করেন।

অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব—সূর্য্যের কিরণের মধ্যে সাতটি রং আছে, সেই সাত রংকে সাতটি ঘোড়া কল্পনা করিয়া ভারতের পুরাণ সূর্য্যকে সপ্তাশ্ব-বাহিত রথের দেবতা কল্পনা করিয়াছেন।

৩৭ পৃষ্ঠা—জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উষ্ম-মনে—গ্রীষ্মকালে ছায়াযুক্ত স্থানকে পরম আরামের মনে হয়। সেইজন্য কবি ছায়াকে জগতের ধাত্রী বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রীষ্মের প্রকোপে সেই স্নিগ্ধ ছায়াও যেন প্রকুপিত হইয়া উঠিয়াছে।

হাতে মাথে ধুনি জ্বালি—পঞ্চধুনি সন্ন্যাসীরা দুই হাতে ও মাথায় সরায় ভরিয়া আগুন লইয়া গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে বসিয়া নিজের নিকটে চারি পার্শ্বে চারিটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করিয়া পঞ্চতপ করে। বসুন্ধরাও যেন সেইরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছেন।

চরু—যজ্ঞের আশীর্ব্বাদী প্রসাদ স্বরূপ পরমান্ন। তুলনীয়—যজ্ঞ হইতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি।—

—কৃত্তিবাস, রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

অন্তঃপুরিকা—৩৮

৩৮ পৃষ্ঠা—সীতা সতী বুদ্ধিমতি ইত্যাদি—অন্তঃপুরিকার মনে এই যে ভাব উদয় হইতেছে, মেঘদূত কাব্যের নির্ব্বাসিত যক্ষেরও মনে জনক-তনয়ার স্নানে পুণ্যোদক রামগিরিতে বাস করিয়া এই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

রিক্তা—৪১ পৃষ্ঠা

সংস্কৃত ভাষার স্বর হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। তাহাতে শব্দের উপর

স্বরাঘাত পড়াতে বাক্য ছন্দ-তরঙ্গিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাংলা শব্দ-উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই। সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষায় শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হয়, তাহা সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় নাই। এ জন্য বাংলার ছন্দ প্রায়ই অক্ষরবৃত্ত, আমাদের ছন্দে অক্ষর গণিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরাঘাতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনার বৈচিত্র্য কবিদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। সকল প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে সফলকাম সিদ্ধহস্ত কবি হইতেছেন ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর। তাঁহার পরে আধুনিক কালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বলদেব পালিত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বরদাচরণ মিত্র প্রভৃতি অনেকে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সকলের কবিতাতেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ অনুসারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর উচ্চারণের উপর ছন্দের ধ্বনি নির্ভর করিয়াছে। ইহা বাংলা ভাষার উচ্চারণের বিরোধী। অতএব ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর উচ্চারণ কৃত্রিম। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলায় ছড়ার ছন্দ আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে বাংলায় কেবল মাত্র যুক্তাক্ষরের বা হসন্ত অক্ষরের পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়, আর পদের অন্ত্যস্বর বিকল্পে দীর্ঘ হয়, অন্যত্র সমস্ত স্বরই হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ মানসী কাব্যের পরে তাঁহার সমস্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন এই মাত্রা বিচার করিয়া। কবি সত্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে সেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দ অনুকরণে নিয়োগ করিয়া বিশেস দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই 'রিক্তা' কবিতাটি যে 'মালিনী' ছন্দে রচিত, তাহার সংস্কৃত রূপ, বাংলায় কৃত্রিম উচ্চারণে রচিত কবিতার রূপ ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার রূপ তুলনায় সমালোচনা করিলে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে।

সংস্কৃত মালিনী ছন্দের নিয়ম হইতেছে—ইহা পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি, ইহার ৭ম ৮ম ৯ম ১১শ ১২শ ১৪শ ১৫শ অক্ষর বা সিলেবল গুরু হইবে, বাকী সব অক্ষর লঘু হইবে, এবং ৮ম ও ৭ম অক্ষরের পরে যতি পড়িবে। যথা—সংস্কৃত রূপ।

৮ ৭
⏑⏑⏑⏑⏑⏑| | | |⏑| | ⏑| |
ন খলু ন খলু বাণঃ | সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ |
মৃদুনি মৃগ-শরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ ।—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ১ম অঙ্কঃ ।

অথ বাংলা কৃত্রিম রূপ—

৮ ৭
⏑⏑⏑⏑⏑⏑| | | |⏑| |⏑| | |
সুতনু অনতিবক্রা | ভ্রূলতা দীর্ঘ-রেখা ; |
প্রণয়-সলিল-পূর্ণ স্নিগ্ধ-নীলাব্জ-নেত্র ।—বলদেব পালিত ।

বাংলার স্বকীয় স্বাভাবিক রূপ—

৮
⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑ | | |⏑| |⏑
উড়ে চ'লে গেছে বুলবুল, | শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর ; |

কনক-ধুতুরা —৪২ পৃষ্ঠা

৪২ পৃষ্ঠা—অতনু-সুষমা—অপরূপ, দেহাতীত, অশরীরী, অথচ অনঙ্গ মদনের মতন উন্মাদন সৌন্দর্য্য।

চাতকের কথা —৪৩ পৃষ্ঠা

সংস্কৃত কবি-প্রসিদ্ধি আছে যে চাতকেরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য জলে তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে না, তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কেবল ফটিক জল বলিয়া মেঘের কাছে জল-বর্ষণ প্রার্থনা করে। তাই একজন কবি বলিয়াছেন—

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে বয়ঃ পয়ঃ ।
চাতকস্য তু জীমূত ভবান এবাবলম্বনম্ ॥

ক্ষ্যাপা হাওয়ায়—৪৪ পৃষ্ঠা

৪৫ পৃষ্ঠা—পম্ভীরা—গুমোট গরম।

রুদ্র-জটা পড়্‌বে ছিঁড়ে—কবি বৃষ্টিধারাকে রুদ্রের জটা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

কুম্ভীরের ওই জিহ্বা-তালুর ঘুচ্‌বে পিঙ্গ বেশ—কবি আকাশকে কুম্ভীরের তালুর সহিত তুলনা করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য পূর্ব্ববর্ত্তী 'চাতকের কথা'

কবিতা, ৪৩ পৃষ্ঠা)। বৃষ্টিধারা নামিলে ঝড়ের ধূলায় ধূসর আকাশের পিঙ্গল বর্ণ ঘুচিয়া তাহার স্বাভাবিক নীল বর্ণ বাহির হইবে।

৪৬ পৃষ্ঠা—মরণ করে অমৃত দান, শিব সে ভয়ঙ্কর—জীবনের পরে মৃত্যু, এবং মৃত্যুর পরে নবজীবন লাভ এই পর্য্যায়-ক্রম চলিয়াছে। কাজেই যিনি মৃত্যু-রূপী ভয়ঙ্কর রুদ্র, তিনিই জীবনরূপী মঙ্গলময় শিব।

চেতন-জড়ে না হয় হবে পাগ্‌ড়ী-বিনিময়—প্রাচীন ভারতের রীতি ছিল মাথার পাগ্‌ড়ী বদল করিয়া দুই ব্যক্তি পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপন করিত। টডের রাজস্থানে পাগ্‌ড়ী বদলের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। খাঁ দৌড়ান খাঁ ছিলেন মহারাজা জয়সিংহের 'পাগ্‌ড়ী-বদল ভাই'। নাদীর শাহ্‌ যখন দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন তখন দিল্লীর সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহ্‌ কোহিনূর হীরক নিজের পাগ্‌ড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। নাদীর শাহ্‌ গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ শাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ছল করিয়া তাঁহার সহিত পাগ্‌ড়ী বদল করেন। এখানে কবি বলিতেছেন যে ঝড় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইলে ঝড়ের বেগে জড় বস্তুও সচল হইয়া উঠিবে, এবং অনেক জীবজন্তু মূর্চ্ছিত হইয়া বা মরিয়া অচল হইয়া পড়িবে, তখন চেতন-অচেতনে কোন প্রভেদ থাকিবে না।

বজ্র কামনা—৪৬ পৃষ্ঠা

৪৮ পৃষ্ঠা—ওযে মিলন ঘটায় কাঞ্চন-ডোরে ইত্যাদি—বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দ্বারা অথবা বৃষ্টির ধারার দ্বারা, অথবা মিল্‌টনের ন্যায় কল্পনা যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে।

যক্ষের নিবেদন—৪৮ পৃষ্ঠা

এই কবিতাটি সংস্কৃত 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে লিখিত। দ্রষ্টব্য ৪১ পৃষ্ঠার 'রিক্তা' কবিতার টীকা। মন্দাক্রান্তা ছন্দের নিয়ম হইতেছে যে ইহা সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি, ইহার প্রত্যেক চরণের ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ১০ম ১১শ ১৩শ ১৪শ ১৬শ ১৭শ অক্ষর বা সিলেবল গুরু ও অন্যান্য বাকী অক্ষরগুলি লঘু হইবে, এবং ইহার ৪র্থ ৬ষ্ঠ ও ৭ম অক্ষরের পরে যতি বা বিরাম থাকিবে। মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূত' এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরচিত। যথা—

। । । । ⏑⏑⏑ ⏑⏑ । । ⏑ । । ⏑ । ।

কশ্চিৎ কান্তা- | বিরহ-গুরুণা | স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

⏑⏑⏑ ⏑⏑ । । ⏑ । । । ⏑ । ।

এবং পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,

৪৮ পৃষ্ঠা—সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি—তুলনীয় 'সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্প-রক্তং দধানঃ।'—মেঘদূত।

৪৯ পৃষ্ঠা—শৈলের পইঠায়—তুলনীয় 'শৈলরাজাবতীর্ণাং স্বর্গসোপান-পংক্তিম্।'—মেঘদূত।

ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস—তুলনীয়—

পাসাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি' মেঘদল
স্বাধীন গগন-চারী, কাতরে নিঃশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হ'তে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন পানে ; … …
—রবীন্দ্রনাথ, 'মেঘদূত' (মানসী)।

পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ—তুলনীয় 'জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং।' সংস্কৃত আবহ-বিদ্যায় মেঘ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—আবর্ত্ত সংবর্ত্ত পুষ্কর দ্রোণ। ইংরেজী মতেও মেঘ চারি প্রকারের।

আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল এ কে—আমিই স্বাধিকার-প্রমত্ত হইয়া প্রভুর নিকট অপরাধী, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার নির্দ্দোষী প্রিয়াকেও বিরহ-দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে।

পাংশু কুন্তল—তুলনীয় 'কঠিন-বিষমাম্ একবেণীং,শুদ্ধ-স্নানাৎ পরুষম্ অলকং'। বিরহিণীদের কেশ-প্রসাধন করা নিষেধ,এই জন্য বিনা তৈলে স্নান করিয়া করিয়া ও মাথা না আঁচড়াইয়া থাকাতে যক্ষনারীর কেশ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মলিন-বেশ—তুলনীয় 'উৎসঙ্গে বা মলিন-বসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং'।

বুকের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন—তুলনীয়—

আশাবন্ধঃ কুসুম-সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি-হৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি !

নির্ম্মল হোক্ পথ—তুলনীয় 'মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্ চানুকূলো যথা ত্বাং'।

বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব—তুলনীয় মেঘদূত—

'সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ'।

বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক—তুলনীয় মেঘদূত—

'মা ভূদ্ এবং ক্ষণম্ অপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রযোগঃ'।

তখন ও এখন—৫৫ পৃষ্ঠা

এই কবিতাটি সংস্কৃত 'রুচিরা' ছন্দে বিরচিত। দ্রষ্টব্য ৪১ পৃষ্ঠার 'রিক্তা' কবিতার টীকা। রুচিরা ছন্দের নিয়ম হইতেছে—ইহা ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি। ইহার ২য় ৪র্থ ৯ম ১১শ ১৩শ অক্ষর বা সিলেব্‌ল গুরু, এবং অন্যান্য অক্ষর লঘু হয়। ইহার প্রত্যেক চরণের ৪র্থ ও ৯ম অক্ষরের পরে বিরাম বা যতি পড়ে। যথা—

⏑ । ⏑ । ¦ ⏑⏑⏑⏑ । | ⏑ । ⏑ । ¦
অভূন্ নৃপঃ ¦ বিবুধসখঃ | পরন্তপঃ ¦

শ্রুতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।—ভট্টিকাব্যম।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ

সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

⏑ । ⏑ । । | ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ । ⏑ ।
তখন কেবল | ভারছে গগন | নূতন মেঘে,

এই কবিতাতে 'তখন' হইতেছে বর্ষাকাল, আর 'এখন' হইতেছে শরৎকাল। এই উভয় কালের প্রাকৃতিক শোভার পার্থক্য ও তারতম্য এই কবিতায় দেখানো হইয়াছে।

প্রাবৃটের গান—৫৬ পৃষ্ঠা

৫৬ পৃষ্ঠা—গগন-পথে বিপুল রথে হেলায়ে হেম-বেত্রে—আকাশে মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহাতে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে।

সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়্জে—ধরণী তাহার দয়িত আকাশের সহিত মিলনের ঔৎসুক্যে অপেক্ষমানা, এবং তাহার মিলন-সম্ভাবনায় সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার হস্ত স্বেদ-সিক্ত হইয়াছে,

এবং তাহার স্বরভঙ্গও হইয়াছে। সেই স্বরভঙ্গের প্রকাশ কেকাধ্বনিতে। ময়ূরের কেকা-রবকে কালিদাস সঙ্গীতের ষড়্‌জ সুরের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন—

ষড়্‌জ-সংবাদিনী কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ।—রঘুবংশ ১ম।

ষড়্‌জ স্বর বাগ্‌যন্ত্রের ছয় স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। যথা—

নাসাং কণ্ঠম্ উরস্-তালু-জিহ্বা-দন্তাংশ্চ সংস্পৃশন্।
ষড়্‌ভ্যঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্‌জ ইতি স্মৃতঃ॥

৫৭ পৃষ্ঠা—বাদল-মালা—জরির সুতা-জড়ানো সোনার মটরাকৃতি গুটিকা।

তুলনীয়—ছাওনী মণ্ডপে সভা, বান্ধএ বাদল-মালা।—শূন্যপুরাণ।

প্রথম হাসি—৫৯ পৃষ্ঠা

৫৯ পৃষ্ঠা—প্রথম হাসির পান-সুপারি—প্রাচীন কালে কাহাকেও কোনে কর্ম্মে প্রথম নিয়োগ করিতে হইলে তাহাকে পান-সুপারি দিয়া বরণ করা হইত। তাহা হইতে পান-সুপারি প্রথম নিয়োগের চিহ্ন হইয়াছে।

ভাদ্র-শ্রী—৬০ পৃষ্ঠা

৬০ পৃষ্ঠা—ইল্‌শে-গুঁড়ি—অতি সূক্ষ্ম বারি-শীকর বর্ষণ হইলে ইলিশ-মাছ জালে বেশি ধরা পড়ে, তাই সেইরূপ গুঁড়ি গুঁড়ি জল-শীকর বর্ষণকে ইল্‌শে-গুঁড়ি বলে।

খাস্‌গেলাস—পূর্ব্বকালে মিছিল বা শোভাযাত্রায় রোশ্‌নাই করিবার জন্য অভ্রের তৈয়ারি গেলাসের আকৃতির ঝাড়ের মধ্যে মোমবাতি জ্বালানো হইত। সেই অভ্র-নির্ম্মিত ঝাড়কে খাস্‌গেলাস বলে।

গুড়-চালেতে ছিটায় গায়ে—বিবাহের সময়ে তুক করিবার জন্য বরের গায়ে গুড়-মাখা চাউল ছিটাইয়া মারা হয়।

নকলী রাতে—প্রকৃত রাত্রি নহে, মেঘাচ্ছন্ন দিনের অন্ধকার যেন কৃত্রিম রাত্রির মতন।

ফুল-সাঞ্জি—৬৫ পৃষ্ঠা

সহজিয়া সম্প্রদায়ের (১৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য) একটি শাখা ফুল-সাঞ্জি ফকীর। ইহারা পরকীয়া নায়িকা নির্ব্বাচন করে এক একটি ফুলকে।

৬৮ পৃষ্ঠা—লুপ্ত যুগের অস্থিগুলো ইত্যাদি—পৃথিবীর লুপ্ত আদি যুগের জীবজন্তুর অস্থি-কঙ্কাল যেমন ভূপঞ্জরের মধ্যে মৃত্তিকা-স্তরে প্রোথিত হইয়া গত যুগের পরিচয় বহন করিতেছে, তেমনি বাঙালী আমাদেরও অতীত কালের পৈতামহিক সংস্কার আমাদের মনের অবচেতনায় লুকায়িত হইয়া আছে,—আমাদের গঙ্গাযাত্রী পিতামহেরা যেমন তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীদের কাছে সহমরণ দাবী করিতেন, তেমনি আমারও ইচ্ছা এমন একটি সঙ্গিনী লাভ করি যে আমার সহমরণে যাইতে আপত্তি করিবে না।

জবা—৬৯ পৃষ্ঠা

৬৯ পৃষ্ঠা—দৃষ্টিভোগের রাঙা খর্পরে রক্ত-কলিজা-কলি—শক্তিপূজায় পশু বলি দিয়া তাহার রক্ত একটি সরায় ধরা হয় এবং সেই বলি-প্রদত্ত পশুর কলিজা বা হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির করিয়া সেই খাপরায় দেওয়া হয়। সেই রক্ত ও হৃৎপিণ্ড দেবীকে ভোগ দেওয়া হয়, খাইতে নহে, দেবী তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা ভোগ করেন। কবি এখানে জবা-ফুলের কলিকাকে শক্তি-পূজায় উৎসৃষ্ট রক্তপূর্ণ খর্পরে রক্তাক্ত কলিজার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তুলনীয়—

ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়। এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল। পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে'
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ-বেদনার মতো!

—রবীন্দ্রনাথ, বিসর্জ্জন।

সৎকারান্তে—৭০ পৃষ্ঠা

কবির মামাতো ভগিনীর মৃত্যুতে লিখিত। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে যে শিশু ছিল তাহার মৃত্যু কবির মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিল।

৭০ পৃষ্ঠা—যম-জাঙালের বক্র মোড়ে—যমের জাঙাল বা প্রাচীর হইতেছে মৃত্যু, যাহার ওপারে আর ইহলোকের দৃষ্টি চলে না।

ছিন্নমুকুল—৭১ পৃষ্ঠা

৭২ পৃষ্ঠা—ছোট্ট যেজন ছিল…সকল শূন্য ক'রে—যে সকলের চেয়ে ছোট ছিল, সে তাহার দেহে ক্ষুদ্র হইয়া গৃহের স্থান অধিক অধিকার করে নাই বটে, কিন্তু সে তাহার অস্তিত্বের দ্বারা সমস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার অভাবে সমস্ত গৃহস্থালী শূন্য বোধ হইতেছে।

ভুঁইচাঁপা—৭৩ পৃষ্ঠা

সাদা ফুল, তাহার কোলে ক্ষীণ নীল আঁজি কাটা, বৈশাখের প্রথম বর্ষণ পাইলেই ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তাহার গাছের একটি পাতাও তখন মাটি ভেদ করিয়া বাহির হয় না, মনে হয় যেন মাটির বুকে কেবল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সব ফুল মরিয়া গেলে বর্ষাকালে এই ফুলগাছের পাতা মাটি ফুঁড়িয়া নির্গত হয়, শীত আসিলেই সব পাতা শুকাইয়া গাছের চিহ্ন পর্য্যন্ত গুপ্ত হইয়া পড়ে।

৭৪ পৃষ্ঠা—মূলের ঘরে মিল যে আছেই—তুলনীয় 'পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।'—রবীন্দ্রনাথ।

ছায়াচ্ছন্না—৭৪ পৃষ্ঠা

৭৪ পৃষ্ঠা—ঘুমে নয়ন আলা—ঘুমে চোখ অলস, শিথিল, ঢুলু ঢুলু।

হাওয়ার ভরে যায় পরীরা—সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়া বহিতেছে।

ঢেউয়ের ফণায় নিব্‌ল হীরা—সমুদ্রের ঢেউ যখন ভাঙিয়া পড়ে তখন তাহাকে সাপের ফণার মতন দেখায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় স্ফুরজ্জ্যোতি (Phosphorescence)—ঝিকমিক করে। কবি আকাশকে সেই সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ও সাপের ফণার সঙ্গে এবং সূর্য্যকে স্ফুরজ্জ্যোতির ও সাপের মাথার মাণিকের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন।

নিদ্‌কুসুমের মালা—ঘুমকে কবি ফুলের মালার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

বৈকালী ফুল ইত্যাদি—বিকালে দেবতাকে যে শীতল ভোগ দেওয়া হয় তাহাকে বৈকালী বলে। আবার বিকালবেলা সম্পর্কীয় বৈকালী। বিকালের ফুলগুলি ফুটিতে না ফুটিতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

ভেরে—ক্লান্ত অবনত হইয়া পড়িল, ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

৮৪ পৃষ্ঠা—হিমে শীতল—কালা—'কালা' মানে অতি শীতল।

গঙ্গার প্রতি—৭৫ পৃষ্ঠা

৭৫ পৃষ্ঠা—লোকপাল বিষ্ণুর প্রসাদ—পৌরাণিক মতে শিবের বা ভগীরথের স্তবে তুষ্ট বিষ্ণু ভক্তিরসার্দ্র হইলে তাঁহার দ্রবীভূত পাদপদ্ম হইতে গঙ্গাধারা নির্গত হন। বিষ্ণু হইতেছেন ভগবানের পালন-রূপ, তাঁহার প্রসাদ-স্বরূপা গঙ্গাও ভূতলকে উর্ব্বর করিয়া লোকপালিকা হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মতে বৈদিক বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্য কর্তৃক সমুদ্র হইতে যে জলবাষ্প আকৃষ্ট হয় তাহাই মেঘে পরিণত হইয়া হিমালয়ের চূড়ায় গিয়া ঠেকে এবং তুষারে পরিণত হয়, এবং সেই তুষার-নদী গলিয়া গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র পঞ্চনদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে।

৭৬ পৃষ্ঠা—ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা—বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা বিনির্গত হইলে বিষ্ণুর চরণামৃত বলিয়া ব্রহ্মা সেই ধারাকে নিজের কমণ্ডলুতে ধারণ করেন এবং পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই ধারা মুক্ত করিয়া দেন এবং তাহা ভূতলে অবতীর্ণ হয়।

তোরে ঘিরি' চিতানল উদ্ধারের শ্বসিছে কামনা—হিন্দুরা গঙ্গাকে পতিত-পাবনী স্বর্গ-সোপান-পংক্তি বলিয়া মনে করে, তাহার তীরে মৃত্যু কামনা করে, এবং তাহারই জলে চিতাভস্ম সম্মিলিত করিয়া দিতে চায়। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে মৃতদেহ-দাহের চিতার আগুন সন সন শব্দ করিয়া যেন উদ্ধারের কামনায় নিশ্বাস ফেলে।

ভারতের অন্ত মধ্য আদি—ভারতের আর্য্য-সভ্যতার ধারা এই গঙ্গাধারাকে অনুসরণ করিয়াই বিস্তৃত হইয়াছিল, সেইজন্য হিন্দুধর্ম্মের বহু প্রধান তীর্থ এই

গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব ভারতের সমস্ত সংস্কৃতি এই গঙ্গাতীর হইতে অতীতে উদ্‌ভূত হইয়াছিল, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।

বারাণসী – ৭৭ পৃষ্ঠা

৭৭ পৃষ্ঠা—অগ্নিহোত্রী—যাহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ করিয়া অগ্নিতে হোম করেন।

বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড জ্যোৎস্নার ন্যায় জ্ঞানোজ্জ্বল হইলেও তাহা উপনিষদের প্রভাবিত ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা হীনপ্রভ; এই কাশীতে যেমন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা আছেন তেমনি তাঁহাদের পাশে পাশে ব্রহ্মবিদ্ বৈদান্তিকও আছেন।

ব্রহ্মদত্ত—আরব্য-উপন্যাসে যেমন হারান্-অল্-রশীদ খলিফাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গল্প বলা হইয়াছে, তেমনি বৌদ্ধ জাতক-গল্পগুলি কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তকে কেন্দ্র করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শাক্যমুনির জাতকে—শাক্যমুনি গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব বহু বহু পূর্ব্বজন্মে জগতে ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রেমের দ্বারা হিংসা ও অধর্ম্ম অন্যায়কে জয় করিয়া ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই বারাণসী জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি'—এই বারাণসীর বিষয় চিন্তা করিলে ইহার বহু প্রাচীন ইতিকথা মানস-নেত্রে প্রতিভাত হইয়া জাগ্রত-স্বপ্নের সৃষ্টি করে।

কাশী-নরেশের কন্যারা—কাশীরাজ দিবোদাসের কন্যা অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা স্বয়ম্বরা হইবেন বলিয়া রাজা স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সভা-মধ্য হইতে মহাবীর ভীষ্ম ঐ তিন কন্যাকে হরণ করিয়া আনেন এবং অম্বা অন্যপূর্ব্বা অন্য-পাত্রে ন্যস্ত-হৃদয়া বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন।—মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০২ অধ্যায়।

হরিশ্চন্দ্র—রাজা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্র রাজার দাতৃত্ব পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকটে সমস্ত রাজ্য দান গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণার

জন্ত রাজাকে স্ত্রী পুত্র ও আত্ম-বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১।৭.৯। দেবী ভাগবত, ৩।১২-১৭।

৭৮ পৃষ্ঠা—বিশ্বামিত্র—বেদে ইনি কুশিক-রাজনন্দন। পুরাণে ইনি কুশবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি গাধীর পুত্র: ইনি প্রথমে প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ তপোবলে ইহার সমস্ত সৈন্যকে পরাজিত করিলে ইনি ব্রহ্মবল লাভের জন্য তপস্যা করেন এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এই সময়ে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গ-গমনের বাসনায় যজ্ঞে ইঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইতে উদ্যত হইলে স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র প্রমাদ গণিলেন এবং ত্রিশঙ্কুর অভিলাষ ব্যর্থ করিবার কৌশল করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তিনি এমন কি পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন যে সশরীরে স্বর্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। ত্রিশঙ্কু নিজের মুখে নিজের কীর্ত্তি ও পুণ্যের বিবরণ দিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পুণ্যক্ষয় হইতে লাগিল এবং তিনি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে পতিত হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিজের তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে আদেশ করিলেন—তিষ্ঠ। তাহাতে ত্রিশঙ্কু না স্বর্গে যাইতে পারিলেন, না মর্ত্তে নামিতে পারিলেন, তিনি অন্তরীক্ষে মধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর বাসের জন্য দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টির উদ্‌যোগ করিলেন এবং নব নব নক্ষত্র গ্রহ সৃষ্টি করিলেন। ত্রিশঙ্কু সেই-সব গ্রহ-নক্ষত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া দেব-সদৃশ প্রভাবে সেই অন্তরীক্ষ-প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল—শাক্যমুনি গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কাশীর মৃগদাব ঋষিপত্তন সারনাথে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন এবং অহিংসা পরমধর্ম্ম এই মত প্রচার করেন।—ললিতবিস্তর।

এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক—রাজগৃহের শৈশুনাগ-বংশীয় রাজা বিম্বিসার কোশল-রাজ প্রসেনজিতের কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া কাশী-প্রদেশ যৌতুক প্রাপ্ত হন আন্দাজ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতকের কাছাকাছি।

নৃপতি অশোক—মগধের মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের পৌত্র, বিন্দুসারের পুত্র, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২ সালে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এবং তাঁহার মৃত্যু হয়

২৩১ খৃঃ-পূঃ। তিনি রাজা হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রমণদিগের বাসের জন্য বিহার বা মঠ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ স্তূপ রচনা করান এবং সেই স্তূপের ঘেরা প্রস্তর-রেলিংএর গায়ে বুদ্ধদেবের জাতক-গল্পের ছবি উৎকীর্ণ করান। এবং বহু স্থানে ন্যায় ধর্ম্ম মৈত্রী করুণা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রস্তর-স্তম্ভে বা পর্ব্বত-গাত্রে তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন উৎকীর্ণ করান।

মহাচীন হ'তে ভক্ত—মহাচীন তিব্বত দেশ হইতে এবং চীন দেশ হইতে বহু তীর্থযাত্রী বুদ্ধদেবের জন্মস্থান ও ধর্ম্ম-প্রচার-স্থান দেখিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। চীনা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে প্রথম আসেন ফা-হিয়েন চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের সময়ে ৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বের কাছাকাছি সময়ে। তাঁহার পরে হিউয়েন-সাং হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে আসেন, এবং হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে ৬৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৯২ সাল পর্য্যন্ত ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইচিং হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে ৬৭৫ হইতে ৬৯২ সাল পর্য্যন্ত ভারত-ভ্রমণ করেন। চীন ও তিব্বতের বৌদ্ধ পরিব্রাজকেরা ভারতে আসিয়া সোনার পাত দিয়া বৌদ্ধস্তূপগুলিকে মণ্ডিত করিয়া যান।

এসিয়ার হৃদয়কেন্দ্র—সমস্ত এসিয়া মহাদেশে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এবং নানাদেশের বৌদ্ধ ভক্ত ভারতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচারক্ষেত্র সারনাথ বা কাশী দর্শন করিতেন এবং এখনো করেন।

ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা—পরম রাম-ভক্ত তুলসীদাস গোস্বামীর জন্ম হয় অযোধ্যা-প্রদেশে ১৪৯৮ হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের কোনো সময়ে, এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১৬২৪ সালে। তিনি অযোধ্যা হইতে কাশীতে আসিয়া বাস করেন এবং রামচরিত-মানস রচনা করেন। তিনি পরম ভক্ত সাধু ব্যক্তি ছিলেন।

কবীর—কবীর সাহেব কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন, ১৩৯৮ বা ১৪৪০ সালে, এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১৪৪৮ অথবা ১৫১৮ সালে গোরক্ষপুরের নিকটে। তিনি মুসলমান জোলার ছেলে ছিলেন, নিজেও তাঁত বুনিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তিনি মহাজ্ঞানী সাধক ছিলেন, তিনি সত্য শাশ্বত ধর্ম্মের তত্ত্ব ও একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তাঁহার কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, তিনি

সকল সম্প্রদায়ের লোককেই সমান উপদেশ দিতেন ও তাহাদের কুসংস্কার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতেন। তিনি তাঁহার বাণী কবিতায় প্রকাশ করিতেন, তাহার একটি ছন্দের নাম দোঁহা। দোঁহা দুই পংক্তির ছন্দ, তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে ২৪ মাত্রা থাকে, এবং ১৩ মাত্রার পরে প্রথম যতি পড়ে। যতি-বিভাগের ১৩ ও ১১ মাত্রার মধ্যেও প্রথম চরণে ৬।৪।৩ মাত্রার পরে বিরাম থাকে এবং পরের চরণে ৬।৪।১ মাত্রার পরে বিরাম হয়।

প্রতাপ রায়—যশোহর মহম্মদপুরের রাজা প্রতাপাদিত্য রায় দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অবশেষে সম্রাট্‌ আকবরের সেনাপতি মহারাজা মানসিংহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত ও বন্দী হন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কাশীতে গিয়া প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয় ১৬১২সালে।

মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু ইত্যাদি—স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে কাশীমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহার মতে কাশীতে মরিলেই মানুষ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে প্রস্থান করে, তাহাকে যমালয়ে যাইতে হয় না।

৭৯ পৃষ্ঠা—পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া—অন্ধকার রাত্রিতে পথিক পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে ও আশ্রয়ের আবশ্যক বোধ করিলে সেখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে গৃহবাতায়নে দীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। তুলনীয়—Kingsley's Poem 'Three Fishers'.

মধুবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা।—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৩। অথবা কর্ম্ম।—বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ ২।৫। সোম।—ঋগ্‌বেদ। অতএব মধুবিদ্যা মানে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মবিদ্যা অথবা কর্ম্ম-সাধন।

কর্ম্মনাশা—কাশী ও বিহারের মধ্যবর্ত্তী নদ। লোকের ধারণা যে সেই নদে স্নান করিলে সকল পুণ্যকর্ম্মের সুফল নষ্ট হইয়া যায়। কীকট অর্থাৎ মগধ ও বঙ্গদেশের সীমা প্রাচীন আর্য্যেরা লঙ্ঘন করিতেন না, তাঁহারা অনার্য্যভূমি বঙ্গদেশে আসিতে ভয় পাইতেন পাছে তাঁহাদের রীতি-নীতি অনার্য্য-সংস্রবে দূষিত হইয়া পড়ে, সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। তাই তাঁহারা বঙ্গদেশকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাখী ও বানরের দেশ বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বঙ্গদেশে কোনো আর্য্য আসিলে তিনি ব্রাত্য বা

ব্রত-পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন এবং তাঁহাকে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আর্য্য-সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে হইত। মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ব্যাসের প্রয়াস—ব্যাস শিব-বিরোধী হইয়া অপর এক কাশী নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস করেন যেখানে মরিলেই শিবত্ব-প্রাপ্তি হইতে পারিবে। কিন্তু অন্নপূর্ণার কৌশলে তাঁহার সেই কাশীতে মরিলে গাধা হইতে হয় এবং সেই কাশীর নাম হইয়াছে ব্যাস-কাশী। দ্রষ্টব্য কাশীখণ্ড, অন্নদামঙ্গল।

স্তম্ব—তৃণগুচ্ছ, জড়, অচেতন পদার্থ।

ঘোষণা করেছ ইত্যাদি—কাশী অন্নপূর্ণার পুরী, কাজেই সেখানে কেহ অভুক্ত, ক্ষুধিত থাকিবে না ইহা পুরাণে অন্নপূর্ণার অঙ্গীকার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিশ্বনাথের আকাশের তলে—কাশীর প্রধান শিবের নাম বিশ্বনাথ, এখানে কবি পরমেশ্বরকে বিশ্বনাথ বলিতেছেন।

ধূলি—৮০ পৃষ্ঠা

৮০ পৃষ্ঠা—মহামানবের ইহা মৌন ইতিহাস—এই ধরার ধূলিতে অতীত কালের যুগযুগান্তরের মানব-সমাজের ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারই উপরে সমস্ত মানব জাতির সমস্ত কর্ম্ম ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আনন্দ-গদগদ চির অশ্রু-পারাবার—এই ধরণীর ধূলিতেই মানুষের সমস্ত আনন্দের ও দুঃখের সাক্ষ্য পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

হিমালয়াষ্টক—৮১ পৃষ্ঠা

৮১ পৃষ্ঠা - ঝোরা—ঝরণা, যাহা হইতে জল সর্ব্বদা ঝরে।

মৃদু-পর্ণিকা—ঢেঁকি শাকের গাছ। Fern.

তুঙ্গ—অতি উচ্চ স্থান, পর্ব্বতশিখর-চূড়া।

অর্ব্বুদ—আবের ন্যায় পিণ্ডাকৃতি বস্তু, এখানে শিলাখণ্ড। Tumour.

স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর—সমুদ্রে তরল তরঙ্গভঙ্গ হয়, কিন্তু পাহাড়ের চূড়ার উত্থান-পতন যেন জমাট-বাঁধা শিলা-তরঙ্গ-যুক্ত সমুদ্রের ন্যায়।

তুলনীয়—হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত।

তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত। রবীন্দ্রনাথ, ‘হিমালয়’।

৮২ পৃষ্ঠা—নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার ইত্যাদি—হিমালয়-শিখরে যে বরফ জমা হইয়া আছে, তাহা গলিয়া গলিয়া বহু নদীর জলধারা অব্যাহত রাখিতেছে এবং সমগ্র উত্তর ভারতের ভূমি শস্তশ্যামলা করিয়া জীবগণের পোষক হইয়া আছে।

নাগবেণী—ফণী-মনসা গাছ। নাগকেশর-গাছ। অথবা নাগলতা।

অতীত-সাক্ষী—হিমালয় পর্ব্বত ভারতের অনাদি অতীত যুগের সাক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান আছে।

বাল্মীকি যার বন্দনা গান—রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ডে রাবণ-কর্ত্তৃক কুবের-পুরী জয় উপলক্ষ্যে।

কালিদাস যার অন্ত না পান—কুমারসম্ভব কাব্যে কালিদাস হিমালয়কে পূর্ব্ব-পশ্চিম সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী পৃথিবীর মানদণ্ড বলিয়াছেন। মেঘদূত কাব্যেও হিমালয়-বর্ণনা আছে। কালিদাসের প্রায় সকল কাব্য-নাটকে হিমালয়ের কথা আছে।

কাঞ্চন-শৃঙ্গ—৮৩ পৃষ্ঠা

৮৩ পৃষ্ঠা—সপ্ত ঋষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ।

অরুন্ধতী—কোনো মতে অত্রির পত্নী, কোনো মতে বশিষ্ঠের পত্নী। তিনি আদর্শ সতী সাধ্বী ছিলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে অরুন্ধতী নক্ষত্রও বিদ্যমান আছে।

শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম—হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরে অরুণ-কিরণ পড়িলে সোনার বর্ণ ধারণ করে, তাহাকেই কবি কালিদাস ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ সোনার পদ্ম বলিয়াছেন। ভোরবেলা অরুন্ধতী নক্ষত্র আকাশে দেখা যায়। কবি কল্পনা করিয়াছেন যেন দেবী অরুন্ধতী হিমালয়-শিখরে সোনার পদ্ম চয়ন করিতে আকাশে উদিত হইয়াছেন। তুলনীয়—

> সপ্তর্ষি-হস্তাবচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ।
> পদ্মানি যস্যাগ্র-সরো-রুহাণি প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ ময়ূখৈঃ॥
>
> —কুমারসম্ভবম্, ১।১৬।

বিভূতি—তোমার ঐশ্বর্য্য, অথবা তুষার-তুহিন-রূপ ভস্মরাশি।

মাটি—৮৫ পৃষ্ঠা

৮৫ পৃষ্ঠা—আধার নিরাধার—নিরালম্বা ধরিত্রী পৃথিবী নিজে সকলকে ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু নিজে নিরালম্ব হইয়া আকাশে দোদুল্যমানা।

তারার হাটে মাটির ভাঁটা—যতগুলি গ্রহ আছে তাহারা কিছু না কিছু ধারণ করিয়া আছে, তাই কবি সেইগুলিকে তারা বলিতেছেন। সেই গ্রহ-সমাজে আমাদের ধরণী কেবল মাত্র মাটির গোলক বই আর কিছু নহেন।

মায়ামুকুর—ম্যাজিক-আয়না, তাহার অর্থাৎ পৃথিবীর একটি সংস্থিতি হইতেছে যে তাহা জীবন-লীলার ক্ষেত্র, আবার অপর পক্ষে পৃথিবী একটি অস্বচ্ছ জড় পিণ্ড মাত্র।

যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে ইত্যাদি—ভাণ্ড ও মনুষ্য একই মৃত্তিকা-উপাদানে গঠিত হয়, মনুষ্যদেহ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভুতের সমষ্টি মাত্র, তাই লোকে কথায় বলে মাটির মানুষ মাটিতে মিশে, Dust thou art, to dust returneth.

তড়িৎ-সুতার লাটাই মাটি—পৃথিবী লাটাইয়ের ন্যায় নিয়ত আবর্ত্তিত হয় ও মেঘ হইতে তড়িৎ আকর্ষণ করে।

মেঘলোকে—৮৬ পৃষ্ঠা

৮৬ পৃষ্ঠা—যক্ষের দূত—মেঘ। তুলনীয় মেঘদূত।

পাশ-মোড়া দিয়া—উলটি-পালটি করিয়া।

অলকাপুরীতে—যক্ষপুরী, যেখান হইতে মেঘদূত কাব্যের যক্ষ প্রভুশাপে রামগিরিতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

ক্রৌঞ্চদুয়ার-পথে—গঢ়বাল রাজ্যের ক্রিতি গিরিপথ। তুলনীয়—মেঘদূত পূর্ব্বমেঘ, ৫৮।

৮৭ পৃষ্ঠা—কূটজ ফুলের—কুড়চি-ফুলের। তুলঃ—মেঘদূত পূর্ব্ব, ৪।

বিশা'য়ের—বিশ্বকর্ম্মা প্রাচীন বাংলায় বিশাই; তাহার।

৮৮ পৃষ্ঠা—প্রমথ—দুঃশাসক, বহুরূপী।

দার্জ্জিলিঙের চিঠি—৯১ পৃষ্ঠা

৯১ পৃষ্ঠা—বন্ধু—কবি সত্যেন্দ্রনাথের সতীর্থ সুহৃৎ, যাঁহাকে কবি তাঁহার 'কুলের ফসল' বই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকেই এই পত্র কবি দার্জ্জিলিংয়ে গিয়া লিখিয়াছিলেন।

ফিরোজা রং—ফিকা নীল বা হরিতাভ নীল রং।

ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী—দার্জ্জিলিং পৌঁছিবার আগে সু-উচ্চ ঘুম-পাহাড় অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ নিম্নে অবতরণ করিয়া দার্জ্জিলিংয়ে যাইতে হয়। সেই ঘুম-পাহাড়ে এক অতি বৃদ্ধা ভুটিয়া রমণী বাস করিত, তাহাকে লোকে ডাইনী মনে করিত, এবং দার্জ্জিলিং-পর্য্যটকেরা তাহাকে দেখিতে যাইত।

দৈব এই স্নানে—দেবতার আয়োজিত যে স্নান-প্রক্রিয়া।

৯২ পৃষ্ঠা—কাঞ্চি-মণির দুল্ দুলিয়ে—দার্জ্জিলিংয়ের ভুটিয়া দাসীদের কাঞ্চি বলে। কাঞ্চি মানে কচি, কিশোরী, ছোট মেয়ে। সেই কিশোরী তরুণীর কানের দুল্ দুলাইয়া মৃদু বাতাস প্রবাহিত হয়। মণি আদরে।

লস্করী চালে—গদাই-লস্করী চালে। গদাই-লস্কর ফার্সী শব্দ, অর্থ ভিক্ষুক-দল। ভিক্ষুক-দলের যেমন কোথাও যাইবার তাড়া নাই, গয়াং-গচ্ছ ভাবে হচ্ছে-হবে করিয়া চলে, তেমনি মন্থর গতিতে।

গায়্‌বী-টোপর—যে টোপর বা মস্তকাবরণ গায়েব অর্থাৎ গোপন করিয়া ফেলে।

বিদূর-ভূমে—বহু-দূরস্থ বা সু-উচ্চ পর্ব্বতের অথবা বৈদূর্য্য বা নীলকান্তমণির পর্ব্বতের প্রান্তভূমিতে। তুলনীয়—

> বিদূর-ভূমির্ নবমেঘ-শব্দাদ্
> উদ্‌ভিন্নয়া রত্ন-শলাকয়েব।
>
> —কুমারসম্ভবম্, ১।৪।

৯৩ পৃষ্ঠা—হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা-যমুনার—হিমালয়ের তুষার-চূড়াতেই আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত নদ-নদীর উৎস সমাহিত হইয়া আছে। সেই তুষার গলিয়াই নদ-নদীর নিরন্তর ধারা রক্ষা করিতেছে।

অলকানগর—মেঘদূত কাব্যে বর্ণিত হিমালয়ের উত্তরে মানস-সরোবরের ও কৈলাস-পর্ব্বতের সন্নিকটে কল্পলোক।

আদিবুদ্ধ—খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নেপাল-তিব্বতে একজন আদিবুদ্ধের কল্পনা করা হয়, তিনি অনাদি অনন্ত অসীম স্বয়ম্ভূ সর্ব্বজ্ঞ।

সুখাবতী—বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত সুখময় স্বর্গ রাজ্য, যেখানে পুণ্যকর্ম্মা গমন করেন।

অবলোকন করেন ভূলোক—আদি-বুদ্ধের শক্তি, করুণা ও পালনী-শক্তির আধার, অবলোকিতেশ্বর ভুবনকে অবলোকন করেন এবং জগতের সকল প্রাণীর মুক্তি না হইলে নিজের মুক্তিও কামনা করেন না।

কবিজনের বাঞ্ছা—কবিরা দেবী সরস্বতীর প্রসাদ-প্রার্থী। যিনি বাগ্‌দেবী বীণাপাণি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি সর্ব্ব-শুক্লা সরস্বতী অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী, তাঁহার প্রসন্ন মুখের জ্যোতিতে সকল অজ্ঞান অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়।

বাংলা দেশের মানুষ ইত্যাদি—ইতিহাসে পাওয়া যায় যে পূর্ব্ব-ভারত হইতে শান্তরক্ষিত, কমলশীল, ধর্ম্মপাল, সিদ্ধিপাল প্রভৃতি ১০১৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যান। বিক্রমপুর-নিবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

৯৪ পৃষ্ঠা—অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় ইত্যাদি—উচ্চ পাহাড়ে জায়গায় বাতাস জল-বাষ্পে ভরা থাকে। এজন্য আলোকের চারিদিকে জলবাষ্পে আভা প্রতিফলিত হইয়া একটি ছটা সৃষ্টি করে। উচ্চ গ্যাসালোকের স্তম্ভের চারিদিকে এইরূপ আলোক-ছটা দেখা যায়।

শিক্ষা-শাসন হেথা ইত্যাদি—শীতের দেশে সর্ব্বদা সাবধানে জামাজোড়া চড়াইয়া থাকিতে হয়, আর আমাদের বাংলা-দেশের শীত-কালেও বিশেষ পরিচ্ছদের আবশ্যক হয় না। তাই কবি হিমালয়-বাসকে গুরুগৃহের কৃচ্ছ্র-সাধনার সহিত এবং বঙ্গদেশ-বাসকে মায়ের মমতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

চূড়ামণি—৯৫ পৃষ্ঠা

৯৫ পৃষ্ঠা—চূড়ামণি—শিরোমণি, মাথার মণি। কবি হিমালয়কে ভারতের চূড়ামণি বলিতেছেন।

সিংহল—৯৬ পৃষ্ঠা

ইংরেজ-কবি স্যর ওয়াল্টার স্কটের

O, Young Loch | invar | is come | out of | the west,

শীর্ষক কবিতার ছন্দে এই কবিতাটি লেখা। ইহা ইংরেজী Spondee ছন্দে লেখা, অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক সিলেবল্ই গুরু বা দীর্ঘ। রবীন্দ্রনাথের গীতালি পুস্তকের প্রথম কবিতার প্রথম দুটি লাইন এই ছন্দে পড়া যাইতে পারে—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই | নাম্‌ল

বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থাম্‌ল।

৯৬ পৃষ্ঠা—কাঞ্চনময় দেশ—লঙ্কা দ্বীপ স্বর্ণ-লঙ্কা, সোনার লঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ। সেই দ্বীপে বোধ হয় পূর্ব্বে সোনার খনি ছিল, অথবা দেশের ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্য হইতে ঐ খ্যাতি হইয়া থাকিবে।

শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ—লঙ্কা দ্বীপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বাল্মীকির রামায়ণে এবং তাহাতে সেদেশের অধিবাসীদের রাক্ষস বলা হইয়াছে। তাহার পরে পালি ইতিহাস মহাবংশে সেদেশের অধিবাসীদিগকে যক্ষ বলা হইয়াছে।

যৌবন তার সিংহের বশ—বিজয়-সিংহ লাঢ় বা লাট দেশ হইতে পিতা ও রাজা সিংহবাহু কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সাত শত অনুচর সহিত অর্ণব-পোতে আরোহণ করিয়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৪৩ সালে বুদ্ধ-পরিনির্ব্বাণের দিনে তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া অবতরণ করেন। এবং আদিম অধিবাসী যক্ষদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সেই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। মহাবংশ—Geiger. বিজয়-সিংহের অবতরণের একটি ছবি অজন্তা গুহার চিত্রের মধ্যে আছে।

বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ-প্রায়—লাঢ় বা লাট দেশ অনেকে মনে করেন বঙ্গের রাঢ় প্রদেশ। বিজয়-সিংহ সিংহলে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং বঙ্গবাসীদিগের সন্ততি দ্বারা সেই দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন, যেমন করিয়া একটি ছোট বট-গাছের বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া ডাল-পালা বিস্তার করিয়া সমস্ত প্রান্তর ছাইয়া ফেলে।

কাঠ শকর যার বল্কল-বাস—Ceylon-moss নামে এক-প্রকার শেওলা সমুদ্রকূলে জন্মে, সুস্বাদু বলিয়া লোকে খায়, এবং রীতি বা উপাস-গাছের ছাল সিংহলের আদিম অসভ্য জাতি বেদ্দারা পরিধান করে।

মন্দির সব গম্ভীর ইত্যাদি—অনুরাধপুরের নিকটে বহু বৃহৎ মন্দির ও পুষ্করিণী আছে। অভয়-বাপী, তিস্‌স-বাপী, গামনী-বাপী প্রভৃতি বহু বাপী ৩য়-৪র্থ শতাব্দীতে খনিত হইয়াছিল।—*Ancient Ceylon* by H. Parker; *A Short History of Ceylon* by H. W. Codrington; *Mahavamsa* by Geiger; *Architectural Remains, Anuradhapura* by Smither.

ফাল্গুন আর দক্ষিণ-বায় ইত্যাদি—ফাল্গুন-মাস আসিলেই দক্ষিণা-বাতাস বহে, তাই কবি বলিতেছেন যে বসন্ত-কালের আর বাসন্তী হাওয়ার বাসস্থান হইতেছে সিংহল।

ছিল সিংহল এই বঙ্গের ইত্যাদি—প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যে দেখা যায় যে বঙ্গের সমস্ত বণিক নায়কেরা সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং পথে নানা বিপদে পড়িতেন। চাঁদ-সদাগর, ধনপতি-সদাগর, শ্রীমন্ত-সদাগর প্রভৃতি সকলেই সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। সিংহল তখনকার কালের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে মসলা ইত্যাদি লইয়া আসিয়া আরব-বণিকেরা ভারতীয় দ্রব্যের সহিত আদান-প্রদান করিত। সিংহল হইতে বঙ্গে চন্দন, কর্পূর, শঙ্খ, মুক্তা এবং বিবিধ মসলা আমদানী হইত।

বঙ্গের বীর সিংহল-রাজকন্যার হয় বর—চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে দেখা যায় যে বাঙালী বণিক শ্রীমন্ত-সদাগর সিংহলে গিয়া সেখানকার রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মহাবংশ নামক ইতিহাসে পাওয়া যায় যে বিজয়-সিংহ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫০৪ সালে সিংহল জয় করিয়া সেখানকার এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন এবং রাজ-রট্ঠ অর্থাৎ রাজ-রাষ্ট্র নামে রাজধানী স্থাপন করেন।

তার কণ্ঠের হার ইত্যাদি—সিংহল হইতে লবঙ্গ, কর্পূর, স্বর্ণ আর মুক্তা আমদানী করা হইত। এখনও সিংহলে কর্পূর ও মুক্তা উৎপন্ন হয়।

সবল তার বুদ্ধের নাম ইত্যাদি—মহাবংশ (৫ম শতকে রচিত ইতিহাস) হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহারাজা অশোকের এক পুত্র মতান্তরে

কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং নির্ব্বাণ লাভ করাকেই বৌদ্ধেরা পরম সম্পদ বলিয়া গণনা করিতে শিখেন।

——See Vincent Smith's History of India, pp. 174-176 2nd Ed.

ওঙ্কার-ধাম—৯৭ পৃষ্ঠা

কম্বোজ দেশের অঙ্কোর-ভট মন্দির। কম্বু নামে একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণ যে উপনিবেশ স্থাপন করেন তাহাই কম্বুজ নামে অভিহিত হয়। সংস্কৃত নগর শব্দ কম্বোজ-ভাষায় উচ্চারিত হয় অনগর, তাহা হইতে অন্‌গর, অঙ্গর, অঙ্কোর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ভট মানে মন্দির। অতএব অঙ্কোর-ভট মানে নগর-মন্দির। যখন ভাষাতত্ত্বের বিশেষ প্রসার হয় নাই, সেই সময়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ অঙ্কোর-ভট শব্দটিকে ওঙ্কার-ধামের অপভ্রংশ মনে করিয়াছিলেন।

See *Un Pelerin D'Angkar*; *Angkor the Magnificient* by H. Churchill Candee.

শোণ নদের প্রতি—৯৯ পৃষ্ঠা

শোণ নদ অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পাটনার নিকটে গঙ্গার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। অমরকোষে শোণ নদের নামান্তর 'হিরণ্যবাহ'।

যেহেতু এই নদের নাম হিরণ্যবাহু, সেই হেতু কবি কল্পনা করিতেছেন যেন কাহার বাহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে যে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে তাহা যেন সেই বাহুর স্ফুরণ। বাহু স্ফুরিত হইলে শুভ নিমিত্ত সূচনা করে।

প্রাচীন পাটলিপুত্র আধুনিক পাটনা শোণ নদের তীরে অবস্থিত। সেই পাটলিপুত্রের রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য। তিনি গ্রীক দূত সেল্যুকাসের কন্যাকে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩০৩ সালে বিবাহ করেন। তাঁহা হইতে মৌর্য্যবংশ স্থাপিত

হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের পুত্র বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের পরে রাজা হন, এবং তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র অশোক-বর্দ্ধন খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২৭২ সালে রাজা হন। তিনি রাজ্যলাভের জন্য তাঁহার ৯৯ জন ভাইকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। তাহার পরে রাজা হইয়া তিনি কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়া বহু লোক হত্যা করেন। ইহাতে তাঁহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং তিনি বুঝিতে পারেন যে অহিংস ধর্ম্ম-পথ ছাড়া শান্তির ও আনন্দের পথ নাই। তিনি এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাশোক নামে পরিচিত হন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াও সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন পরিধান করিতেন এবং নিজে নিস্পৃহ হইয়া কেবল প্রজাহিতে ও জীবহিতে রাজ্য পরিচালনা করিতেন এবং যাহাতে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার রাজকর্ম্মচারীরা ও প্রজারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া ন্যায় অনুষ্ঠান করে তাহার জন্য তিনি স্থানে স্থানে শিলায় পর্ব্বত-গাত্রে বা প্রস্তর-স্তম্ভে তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩১ সালে।

শিখদের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দসিংহ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭০৮ সালে স্বর্গারোহণ করেন। কিম্বদন্তী আছে যে তিনি কিছুদিন পাটনায় অবস্থিতি করিয়া শিখজাতিকে সঙ্ঘ-বদ্ধ করিবার ও খালসাতে পরিণত করিবার তপস্যা করেন।

সিদ্ধিদাতা—১০০ পৃষ্ঠা

১০০ পৃষ্ঠা—হাজার জীবন নষ্ট হ'লে ইত্যাদি—নর-মুণ্ডাসনে উপবিষ্ট গনেশ-মূর্ত্তি দেখিয়া কবি মনে করিতেছেন যে সেই মূর্ত্তির দ্বারা এই কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে বহু ব্যক্তির আত্মদান ও বিফলতার উপরে অবশেষে সিদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

দুর্গমে কে যাত্রা ক'রে যবদ্বীপে করলে জয়—ফা-হিয়ান দেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে জাহাজ-ডুবি হইয়া ৪১৩ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপে গিয়া উত্তীর্ণ হন। তখন তিনি সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দেখেন।

বিশ্বামিত্র পীড়া দিল—বিশ্বের অমিত্র বিশ্বামিত্র মহাদেবের তপস্যায়

অস্ত্র লাভ করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের নিকটে পরাজিত হন। তখন তিনি বশিষ্ঠকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে রাজর্ষি হইবার বর দিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তপস্যা করিয়া রাজা ত্রিশঙ্কুর জন্য নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। পরে ব্রহ্মার বরে ঋষিত্ব, ঋষি-মুখ্যত্ব লাভ করিয়া অনেক কষ্টে জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তিনি নিজের পুত্র শুনঃশেফকে রাজা হরিদশ্বের যজ্ঞে পশু-রূপে দান করেন।

—রামায়ণ ১।৫০—৭০। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ১।৭—৯।

কারো হঠাৎ নিব্‌ছে বাতি ইত্যাদি—কেহ বা হতাশায় চারদিক অন্ধকার দেখে, এবং কাহারও বা মাথা ঘুরিতে থাকে।

পদ্মার প্রতি—১০২ পৃষ্ঠা

১০৩ পৃষ্ঠা—কীর্ত্তিনাশা—রাজা রাজবল্লভ সেন (১৬৯৮—১৭৬৩) মুর্শীদকুলী খাঁ, আলিবর্দ্দী খাঁ ও হুসেনকুলী খাঁর অনুগ্রহে প্রথমে ঢাকার, পরে মুঙ্গেরের, সুবেদার নিযুক্ত হন। সম্রাট্ শাহ্ আলম তাঁহাকে মহারাজ রায়-ই-রায়াঁ সলারজঙ্গ বাহাদুর উপাধি দেন এবং তাঁহার জমিদারীর আয় ৯ লক্ষ টাকা হয়। কিন্তু তাঁহার রাজধানীর সমস্ত সৌধ মন্দির পদ্মার ভাঙনে নষ্ট হইয়া যাওয়াতে পদ্মার কীর্ত্তিনাশা বলিয়া দুর্নাম রটে।

শূদ্র—১০৪ পৃষ্ঠা

১০৪ পৃষ্ঠা—আদি-দেবতার চরণের ধূলি—শূদ্র ভগবানের পদ হইতে উৎপন্ন।—ঋগ্‌বেদ ১০।৯০। মনুসংহিতা ১।৩১।

পাগ্‌লা-ঝোরা—১০৭ পৃষ্ঠা

দার্জ্জিলিং পাহাড়ে যাইবার পথে রেল-লাইনের ধারে এই ঝরণাটি দেখা যায়। ইহার বেগ আগে দুর্বার ছিল, তাই ইহার নাম হয় পাগ্‌লা-ঝোরা। কিন্তু পরে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারেরা ইহার সুবিস্তীর্ণ দেহকে বহু ধারায় বিভক্ত করিয়া ইহার কলেবর ক্ষীণ ও বেগ হ্রস্ব করিয়া দিয়াছেন।

১০৭ পৃষ্ঠা—সিন্ধু-নদের সোদর ইত্যাদি—যে হিমালয়ের বরফ গলিয়া সিন্ধু গঙ্গা প্রভৃতির উৎপত্তি, সেই বরফরাশি হইতেই পাগ্‌লা-ঝোরার উদ্ভব। তাই সে সিন্ধুর ও গঙ্গার সোদর।

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি—তরল জলধারা হইতে যে জল-শীকর-কণা ধূলির ন্যায় সূক্ষ্ম কণিকায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

বিনিসুতার রাস্নামালা—পরগাছার (Orchid) সংস্কৃত নাম রাস্না। পরগাছার ফুল লম্বা ছড়া ছড়া হয়, যেন একগাছি মালা; কিন্তু তাহাতে তো সুতা নাই, তাই সেই মালাকে কবি বিনা সুতায় গাঁথা মালা বলিয়াছেন।

বাকল-ঝাঁঝি—প্রাচীন গাছের গায়ের ছালে শেওলা (lichens) জন্মে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশের পরাধীনতায় সর্ব্বদাই ক্লেশ অনুভব করিতেন এবং যেখানে কোনো বন্ধন দেখিতেন তাহাই ছিন্ন করিবার আগ্রহে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। পাগ্‌লা-ঝোরার বন্দী-দশাতেও তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া মুক্তি খুঁজিতেছে।

দুর্ভিক্ষে—১০৯

১০৯ পৃষ্ঠা—লক্ষ্মী-মোহর—লক্ষ্মীপূজার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা মোহর, যেটি সম্পদ ও সঞ্চয়ের চিহ্ন।

জনার্দ্দনের রূপার ছাতা—জনার্দ্দন নামক শালগ্রাম শিলার সিংহাসনের উপর যে রূপার ছাতা থাকে, সেই দেবতার দ্রব্যও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে।

কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে—কাহারো বা পেটের পীড়া হইতেছে।

১১০ পৃষ্ঠা—চোখের আগে অন্‌কি ওড়ে—ক্ষুধায় কাতর মরণাপন্ন হইয়া মনে হইতেছে যেন চক্ষের সম্মুখে ছোট ছোট পোকা অন্‌কি উড়িতেছে, চক্ষে ধোঁয়া দেখিতেছি, মাথা ঝিমঝিম করিতেছে।

প্রাণ রাখো প্রাণ হানি ক'রে—তুলনীয়—

এ জগৎ মহা-হত্যাশালা! জানো না কি
প্রত্যেক পলক-পাতে লক্ষ কোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে? সে কাহার খেলা?

হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি,
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট ;
তাহারা কি জীব নহে ? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্ব-পত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে, নির্ম্মল আকাশে ;
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে !
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগ-সম মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কাল-স্বরূপিণী রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষা-তীক্ষ্ণ লোল জিহ্বা মেলি'—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির-রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হ'তে
রসের মতন অনন্ত খর্পরে তাঁর।

—রবীন্দ্রনাথ, বিসর্জ্জন, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।

সাগর-তর্পণ—১১১ পৃষ্ঠা

১১১ পৃষ্ঠা—বীরসিংহের সিংহ-শিশু—পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯১ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি যে পরবর্ত্তীকালে পুরুষসিংহ বীর হইবেন তাহার সূচনা হইয়াছিল বীরসিংহ গ্রামে জন্মলাভে।

সাগরে যে অগ্নি থাকে—সাগরের বড়বানল কেবল কবিকল্পনা নয়, বিদ্যাসাগরের তেজ বীর্য্য সাহস তাহার সাক্ষী।

যজ্ঞ বিশ্বজিৎ—পূর্ব্বেকার রাজারা সমস্ত দেশ জয় করিয়া আনিয়া

একেবারে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতেন। কালিদাসের রঘুবংশ-কাব্যে রঘুর দিগ্‌বিজয় ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করার বিবরণ আছে; ইতিহাসেও পাই যে মহারাজ কণিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন ও অশোক এইরূপ সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

১১২ পৃষ্ঠা—ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি—বিদ্যাসাগর-মহাশয় সর্ব্বদাই ঠনঠনিয়ার চটি পায়ে দিতেন এবং তাহাই পরিয়া লাটদরবারেও যাইতেন এমনি তাঁহার তেজ ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ছিল।

শিক্ষা দিতে অহস্তে ইত্যাদি—তখন সংস্কৃতকলেজ হিন্দু-কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালের অধীন ছিল। সংস্কৃতকলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু-কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল কার্ সাহেবের নিকটে কলেজের কাজের জন্য যান্। কার্ সাহেব টেবিলের উপর বুটজুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনেন, তাঁহাকে বসিতেও অনুরোধ করেন না। ইহার কিছুদিন পরে কার্ সাহেব সংস্কৃত-কলেজ পরিদর্শন করিতে আসেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় তাঁহায় ধূলায় ধূসর চটিজুতা শুদ্ধ পা টেবিলের উপর তুলিয়া কারের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, কার্‌কে বসিতে অনুরোধ করেন না। কার্ অপমানিত বোধ করিয়া ডিরেকটার অফ্ পাব্‌লিক্ ইনস্‌ট্রাক্‌সান Mowat সাহেবের নিকটে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের নামে নালিশ করেন। মাওয়াট সাহেব বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের কৈফিয়ৎ তলব করিলে তিনি উত্তর দেন—'আমরা অসভ্য বঙ্গবাসী, ইংরেজদের শিষ্টাচার দেখিয়া আমরা আদব-কায়দা শিক্ষা করি। কার্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে এইরূপ ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার শিক্ষানুসারে তাঁহাকে ঐরূপভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছি। ইহাতে আমার কোনো দোষ বা ত্রুটি হইয়াছে মনে করি না।' এই কৈফিয়ৎ পাইয়া মাওয়াট সাহেব কার্‌কেই দোষী স্থির করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন।

সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌বো তারে—নন্দিগাঁয়ে—রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিলে ভরত তাঁহার পাদুকা লইয়া রামচন্দ্রের পরিত্যক্ত স্বর্ণসিংহাসনের উপর স্থাপন করেন এবং আনন্দহীন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া নন্দিগ্রামে

দিয়া রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যরক্ষা করেন এবং রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় সন্ন্যাসীবেশে ১৪ বৎসর যাপন করেন।

নজর কারো লাগ্‌বেনাকো—নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সময় কুলোকের কুদৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য ছেঁড়া-জুতো মুড়ো-ঝাঁটা ও ভাঙা-ঝুড়ি টাঙাইয়া দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর-মহাশয় স্বদেশ-প্রীতির যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা যাহাতে অটুট থাকে তাহার জন্য বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের চটিজুতার মাহাত্ম্য সকলের মনে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে ইত্যাদি—শাস্ত্র রচনার উদ্দেশ্য সামাজিক মঙ্গলবিধান। তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের কল্যাণকর না হইয়া যদি কাহারো উপর নির্ম্মম অত্যাচারের কারণ হয় তবে সেই শাস্ত্র পরিত্যাজ্য। যে-সমস্ত শিখাধারী পণ্ডিত শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থ লইয়া কিতণ্ডা করেন ও অক্ষরের মাথায় রেফের ন্যায় শিখা আন্দোলন করেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সহৃদয় পাণ্ডিত্য দেখিয়া আত্ম-সংশোধন করুন।

পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার—কাশীর পাণ্ডারা গুণ্ডা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর-মহাশয় কাশীতে গেলে পাণ্ডারা তাঁহাকে পাথরের নুড়িকে বিশ্বেশ্বর বলিয়া পূজা করাইতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন পিতা-মাতাই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা।

ঐ নামে হায় লোভ করেছে ইত্যাদি—বিদ্যাসাগর পদবী ঈশ্বরচন্দ্রের নামের সহিত যোগরূঢ় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ন্যায় যদি কেহ সাহস, বীর্য্য, সহৃদয়তা, দয়া দেখাইতে পারেন তবে তাঁহারই ঐ পদবী গ্রহণ করা সাজে, নতুবা প্রাংশু-লভ্য ফলের জন্য উদ্বাহু বামনের ন্যায় তাহারা হাস্যাস্পদ।

লরেল্—১১৩ পৃষ্ঠা

লরেল—ইউরোপের এক প্রকারের চির-হরিৎ ঝোপ গাছ। গ্রীক পুরাণে ইহার নাম ড্যাফ্‌নী। ড্যাফ্‌নী ছিলেন নদী-দেবতার কন্যা। এপোলো বা সূর্য্যদেব ড্যাফ্‌নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। তখন ড্যাফ্‌নী এপোলোর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য

দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা তাহাকে লরেল-গাছে পরিণত করিয়া দেন। তদবধি সেই গাছের নাম হইয়াছে ড্যাফ্‌নী এবং এই গাছ এপোলো দেবের প্রিয় বলিয়া পবিত্র। প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে বিজয়ী বীরকে লরেল-শাখার মুকুট পরাইয়া সম্মানিত করা হইত। তদবধি ইহা বীরত্বের পুরস্কারের প্রতীক রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এপোলো আবার কবিদেরও কবিত্বের অধিষ্ঠাতা দেবতা। সেই জন্য কবিদেরও কবিত্বের জন্য সম্মান দেখাইতে এই লরেলের মুকুট পুরস্কার দেওয়া হইত।

১১৩ পৃষ্ঠা—অন্ধকবি হোমারের ইত্যাদি—গ্রীসের আদি কবি হোমার অন্ধ ছিলেন, তিনি নগরে নগরে বীণা বাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। হোমার তাঁহার সুবিখ্যাত ইলিয়াড কাব্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বিজয়ী বীরকে অলিভ বা জলপাই-গাছের শাখার মুকুট পরাইয়া সম্মানিত করিতে হইবে।

Daicles the Messenian won the foot race at the 7th Olympia in 752 B. C., and received the First Victor's wreath from King Iphetus of Elis according to a Delphic oracle....... Duncker's History of Greece, and Alleyne and Abbott's History of Greece.

দান্তের প্রথম প্রিয়া—বলোগ্‌নার রাজ-দরবারে আসিয়া লরেলের মুকুট গ্রহণ করিবার জন্য ১৩১৯ সালে দান্তেকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। র‍্যাফেল-কর্ত্তৃক অঙ্কিত A Detail of the Parnassus ছবিতে দান্তের মাথায় তিনি লরেলের মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন।

কবি-প্রশস্তি—১১৪ পৃষ্ঠা

ঋষি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জন্ম হয় বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ; খৃষ্টীয় ১৮৬১ সালের ৬ই মে। ১৩১৮ সালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হইলে প্রধানতঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথের পরামর্শে ও উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে দিয়া ১৩২৮ সালের ১৪ই মাঘ (২১এ

জানুয়ারী ১৯১২) কলিকাতা টাউন-হলে কবি-সম্বর্দ্ধনা করানো হয়। ইহার পরে ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর কবিসম্রাট নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা ইউনিভারসিটি D. Litt. বা সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দিয়া ১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সম্বর্দ্ধনা করেন।

কবি-সম্বর্দ্ধনার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ এই "কবি-প্রশস্তি" কবিতাটি পুঁথির আকারে হাতীর দাঁতের পাটায় উৎকীর্ণ করাইয়া কিংখাব-কাপড়ে বাঁধিয়া কবিকে উপহার দিয়া অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেন।

১১৪ পৃষ্ঠা—পূর্ণাতিথি ইত্যাদি—১৬ পৃষ্ঠার 'লব্ধ-দুর্লভ' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

মধুচ্ছন্দা—বিশ্বামিত্রের পুত্র, ঋগ্বেদের প্রথম ১০ সূক্তের ঋষি। তাঁহার ছন্দ বা রচনা মধুময় বলিয়া তাঁর এক নাম মধুচ্ছন্দা, এবং সকল জীবে তাঁহার মৈত্রী ছিল বলিয়া তাঁহার অপর নাম হইয়াছিল বিশ্বমিত্র।

১১৫ পৃষ্ঠা—অর্দ্ধশত শরতে—ইংরেজীতে যুবার বয়সের বৎসর সংখ্যাকে বসন্ত বা গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বারা এবং বৃদ্ধের বয়সের বৎসর সংখ্যাকে শীতঋতুর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বৈদিককালে ভারতবর্ষে শরৎ ঋতুর দ্বারা বয়স সূচিত হইত।

গভীরতর প্রাণের প্রীতি—রবীন্দ্রনাথ প্রেমের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বহুরে যা এক করে; বিচিত্রেরে করে যা সরস।

—স্মরণ, প্রেম।

অমৃত এনে দিয়েছে শ্যেনে—১১৬ পৃষ্ঠার '১৪ই জ্যৈষ্ঠ' কবিতাব টীকা দ্রষ্টব্য। স্বর্গে গুপ্ত সোমকে সুপর্ণ বা শ্যেন আহরণ করিয়া মর্ত্ত্যে আনেন।—ঋগ্বেদ। পুরাণে এই শ্যেন হইয়াছে গরুড়। সুপর্ণী হইয়াছেন বাগ্দেবী, গায়ত্রী।

প্রত্ন—প্রতন, পুরাতন।

হিরণ্ময় মৃণাল-ডোরে ইত্যাদি—

তব লাগি স্তব্ধ শোক স্নিগ্ধ দুই হাতে

* * * *

সব ভালো-মন্দ নিয়ে মোর প্রাণ দিক এক ক'রে
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে।—স্মরণ।

১১৬ পৃষ্ঠা—মত্ততারে করেছ ঘৃণা—

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন-ভক্তি-মদধারা
নাহি চাহি নাথ। দাও ভক্তি শান্তরস
*　　*　　*　　*
সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত র'বে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর—নৈবেদ্য।

যে ভাব ওঠে প্রাণের মাঝে ইত্যাদি—তুলনীয়—

পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী জেনো।—ক্ষণিকা, কবির বয়স।
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি ক'বে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।
—উৎসর্গ, কবিচরিত।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—১১৬ পৃষ্ঠা

কবি সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ স্বনাম-খ্যাত সাহিত্যিক ও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ধুরন্ধর লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৮৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ন্যায় জ্ঞান-তপস্বী স্বাধীন-চিন্তাশীল মনীষী সকল দেশেই দুর্লভ।—দ্রষ্টব্য অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত,—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি; জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার—কালীচরণ মিত্র; বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য—কেদারনাথ মজুমদার; আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই-প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩১ পৃষ্ঠা।

১১৭ পৃষ্ঠা—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়—সুপর্ণ গরুড় স্বর্গ হইতে যেমন অমৃত আহরণ করিয়া আনেন, ইন্দ্রের বজ্রকেও ভয় করেন নাই, তেমনি অক্ষয়-কুমার জ্ঞান আহরণে তন্ময় ছিলেন।—ঋগ্‌বেদ, শতপথব্রাহ্মণ, পুরাণ দ্রষ্টব্য। এই সুপর্ণীই বাগ্‌দেবী, গায়ত্রী।

অর্ঘ্য—১১৮ পৃষ্ঠা

১১৮ পৃষ্ঠা—নেতধটি ইত্যাদি—প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দেখা যায় নেত বস্ত্র (সংস্কৃত নেত্রাংশু) সেকালের শ্রেষ্ঠ বস্ত্র ছিল। কাহাকেও পুরস্কার দিতে হইলে নেতধটি বা পাটের পাছড়া উপহার দেওয়া হইত। কবি কৃত্তিবাস যখন বড়গঙ্গার পারে গৌড়ের রাজার সভায় উপস্থিত হন, তখন—

রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।

—কবি কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়।

বিশ আড়া ধান ইত্যাদি—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যখন স্বগ্রাম দামুন্যা হইতে ডিহিদার মামুদ সরীপের অত্যাচারে উদ্বাস্তু হইয়া মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভুম পরগণার আড়রা রাজধানীতে রাজা বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের শরণাপন্ন হন, তখন রাজা কবিকঙ্কণকে "পাঁচ আড়া মাপি' দিলা ধান।" কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ।

পরগণা লিখে ইত্যাদি—ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর বর্দ্ধমানের রাজার অত্যাচারে রাজ্যভ্রষ্ট ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া অনেক কষ্ট ভোগের পরে ফরাসডাঙ্গা-চন্দননগরে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন ঐ দেওয়ানজীর অনুরোধে নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিগুণাকরকে ৪০৲ টাকা মাসিক বেতনে নিজ সভাকবি নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার কবিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ বার্ষিক ৬০০৲ টাকা আয়ের মূলাজোড় পরগণা দান করেন।

জনক রাজার মতো ইত্যাদি—বিদেহ-রাজ জনক ব্রহ্মবিদ্ রাজর্ষি ছিলেন। তিনি এক সহস্র দুগ্ধবতী গাভীর প্রত্যেক শৃঙ্গে দশ দশ তোলা স্বর্ণ বাঁধিয়া দিয়া প্রচার করেন যিনি ব্রহ্মিষ্ঠতম ব্রহ্মবিত্তম তিনি উহা গ্রহণ করুন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ঐ সহস্র গাভী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে গার্গী তাঁহার ব্রহ্মিষ্ঠতমতা অস্বীকার করিয়া ঐ গাভী স্বয়ং গ্রহণ করেন।—বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্ ৩য় অধ্যায়।

ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী—বচক্নু ঋষির কন্যা বাচক্নবী গার্গী তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৬।৬।১; বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্ ৩য় অধ্যায়।

———

চৌদ্দ প্রদীপ—১১৯ পৃষ্ঠা

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিকে অর্থাৎ কালীপূজার পূর্ব্ব চতুর্দ্দশীকে ভূত-চতুর্দ্দশী বা যম-চতুর্দ্দশী বলে। ঐদিন সন্ধ্যাকালে চতুর্দ্দশ প্রদীপ দিতে হয় এবং পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিতে হয়। এই যম-চতুর্দ্দশীতে পিতৃপুরুষেরা যমলোক হইতে পিতৃযান দিয়া মর্ত্ত্যলোকে বংশধরদিগের শ্রদ্ধা পাইবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই জন্য সকল লোককে প্রজ্বলিত উল্কা হস্তে লইয়া পিতৃগণকে পথ দেখাইতে হয়। ঋগ্-বেদের দশম মণ্ডলে কয়েকটী সূক্তে পিতৃলোক ও পিতৃযানের উল্লেখ আছে। তিথিতত্ত্ব প্রভৃতিতেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

১১৯ পৃষ্ঠা—সপ্ত ঋষি—৮৩ পৃষ্ঠার 'কাঞ্চন-শৃঙ্গ' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

ত্রিশঙ্কু ও বিশ্বামিত্র—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কুকে বিশ্বামিত্র সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করেন।—রামায়ণ ১।৫৭—৬২ সর্গ; হরিবংশ ১২—১৩ অধ্যায়। রামায়ণ ১।৫০—৭০। ৭৭ পৃষ্ঠার 'বারাণসী' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্য—কাশীবাসী ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বতকে অবনত অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যে বর্ত্তমান বিজাপুর ও নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বাতাপি ও ইল্বল (বর্ত্তমান বাদামি ও ইলোরা) প্রভৃতির দেশে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার করিতে যাত্রা করেন।—মহাভারত বনপর্ব্ব ১০৪; স্কন্দপুরাণ।

বুদ্ধ—মৈত্রী করুণা জ্ঞান ও প্রেমের আধার।

পরাশর—ঋষি বশিষ্ঠের পৌত্র, শক্তির পুত্র; বিশ্বামিত্রের শাপে শক্তি ও তাঁহার শত ভ্রাতা রাক্ষসকর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। পরাশর রাক্ষস-বধের সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লন।—লিঙ্গপুরাণ, ৬৪ অধ্যায়।

মৈত্রেয়ী—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদিনী পত্নী। ইঁহারই প্রসিদ্ধ বাণী—"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিমু কুর্য্যাম্"।

অরুন্ধতী—ঋষি বশিষ্ঠের পত্নী, আদর্শ পতিব্রতা। সপ্তর্ষির পত্নীদের মধ্যে ছয় জনেরই চরিত্র স্খলন ঘটে, কেবল অরুন্ধতী প্রলোভন জয় করেন।—লিঙ্গপুরাণ; মহাভারত বনপর্ব্ব স্কন্দোপাখ্যান; স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ১৮ অধ্যায়।

দ্বৈপায়ন—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নাম হইয়াছিল দ্বৈপায়ন।

ভীষ্ম—কুরুবংশীয় শান্তনুরাজা ও গঙ্গাদেবীর পুত্র। দুষ্কর কৌমার-ব্রতধারী মহাবীর।

ভরত সর্ব্বদমন—দুষ্মন্তরাজার পুত্র সর্ব্বদমন ভরত, অথবা মনু-বংশীয় আগ্নীধ্রের পুত্র ভরতের নাম হইতে ভারতের নাম হইয়াছে।

অশোক—৯৯ পৃষ্ঠার 'শোণ নদের প্রতি' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রতাপ—চিতোরের রাণা স্বদেশপ্রাণ প্রতাপসিংহ সম্রাট্ আকবরের চিতোর আক্রমণে বাধা দিয়া ১৫৭৬ সালে হল্‌দিঘাটে যুদ্ধ করেন। ১৫৯৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। অথবা বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য যিনি ১৫৭৬ সালে যশোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৬১২ সালে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া দিল্লী যাইবার পথে কাশীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিজয়সিংহ—৯৬ পৃষ্ঠার 'সিংহল' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

বিক্রম অভিনব নবরত্নের ধনী—উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ৯জন পণ্ডিত ও কবি নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কুঃ।
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ॥
খ্যাতো বরাহ-মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্ নব বিক্রমস্য॥

যবনী রাণীর……মৌর্য্যমণি—মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাস নিকোটারকে পরাজিত করেন; সেলিউকাস খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০৩ সালে চন্দ্রগুপ্তকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করেন।—'Strabo, Megasthenes'.

১২০ পৃষ্ঠা—এপারে প্রদীপ উল্কা ওপারে—সম্বৎসরের মধ্যে কার্ত্তিক (নভেম্বর) মাসেই সমধিক উল্কাপাত হয়।

দেশবন্ধু—১২১ পৃষ্ঠা

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্ত একসঙ্গে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যান। ১৮৬৯ সালে তিনি ঐ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং নানা স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টারের কাজ করিয়া ১৮৯৪ সালে অস্থায়ী ভাবে বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। দেশী লোকের মধ্যে ঐ পদ তিনিই প্রথমে পান। কর্ম্মে অবসর লইলে তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯০৯ সালে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৯০৯ সালেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন। তিনি দেশ-প্রীতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত, রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা, সমাজ, সংসার প্রভৃতি উপন্যাস, Ancient Civilization of India, Economic History of British India রচনা করেন এবং ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ও ঋগ্‌বেদ বাংলায় অনুবাদ করেন।

বিশ্ববন্ধু—১২২ পৃষ্ঠা

William Stead (১৮৪৯—১৯১২) Pall Mall Gazette এবং Review of Reviews পত্রের প্রসিদ্ধ নির্ভীক ন্যায়পরায়ণ সম্পাদক ছিলেন। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, সামাজিক দোষ সংশোধন করিয়া সমাজকে উন্নত করিবার জন্য এবং ফৌজদারী আইনের কঠোরতা ও অসঙ্গতি নিবারণের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

১২২ পৃষ্ঠা—ঋতম্ভর—ঋগ্‌বেদে দেবতাকে "ঋতস্য গোপা"—সত্যের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ঋত=কারণ—সত্তা, অবিনাশী সত্তা, সত্যজ্ঞান। ঋতম্ভর=সত্য জ্ঞানধারী।

অভিচার-মন্ত্র—মারণ, উচাটন ও বশীকরণের মন্ত্র।

লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি—আমেরিকা যাইবার সময়ে টাইটানিক জাহাজ

ভাসমান তুষার-পর্ব্বতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত যাত্রীর সহিত ডুবিয়া যায়। সেই জাহাজে ষ্টেড্ সাহেব ছিলেন।

শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে—১২৩ পৃষ্ঠা

হরিনাথ দে ১৮৭৭ সালে জন্মলাভ করেন, তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯১১ সালে। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভূতনাথ দে, তিনি পশ্চিমে ওকালতী করিতেন। হরিনাথের মাতা বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী এই পাঁচটি ভাষা জানিতেন। পুত্র হরিনাথও ৩০টি ভাষায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষায় এম, এ, পাস করেন শতকরা ৯০ নম্বর পাইয়া। পরে কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে গিয়া ভাষা-শিক্ষায় দক্ষতার জন্য স্মিথ-প্রাইজ ও গ্রীক ও লাতিন কবিতা লেখায় দক্ষতার জন্য লর্ড্ চেন্‌সেলারের মেডাল লাভ করেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া গভর্মেণ্ট্ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং গভর্মেণ্টের প্রবর্ত্তিত ভাষা-পারদর্শিতার পরীক্ষায় বারম্বার উত্তীর্ণ হইয়া পালির জন্য ২০০০৲, সংস্কৃতের জন্য ২০০০৲, আরবীর জন্য ৫০০০৲, এবং উড়িয়ার জন্য ১০০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। তিনি হিব্রু চীনা জাপানী ফার্সী তিব্বতী প্রভৃতি এসিয়ার বহু ভাষা এবং ইউরোপের সকল দেশের ভাষা জানিতনে।

১২৩ পৃষ্ঠা—যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা—জুলিয়াস সিজার ও তাঁহার পরে ক্রিশ্চানেরা ৩৯১ সালে সেকেন্দ্রিয়ার বৃহৎ লাইব্রেরী দগ্ধ করিয়া ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কুণ্ডলী পুড়াইয়া ফেলেন। খলিফা ওমারের নামে যে অপবাদ প্রচলিত আছে তাহা এখন মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আচার্য্য—সংস্কৃত-সাহিত্যে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

লামা—তিব্বতী বিদ্যায় সুপণ্ডিত।

প্রোফেসার—ইউরোপীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত।

ফুঙি—বর্ম্মী পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

শম্‌স্‌-উল্‌-উলেমা—আরবী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

ভট্ট—পণ্ডিত, দার্শনিক, ভাষ্যকার, অধ্যাপক। এক বেদ যাঁহার কণ্ঠস্থ।

মৌলবী—ফার্সী আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিত।

কোকিল কুকু বুল্‌বুলিতে—কোকিল ভারতীয় বাণীর প্রতীক, কুকু ইউ-রোপীয় বাণীর প্রতীক, বুল্‌বুলি পারস্তের বাণীর প্রতীক।

বাবিল্-চূড়া—Deluge বা জলপ্লাবন হইয়া যাইবার পরে নোয়ার পুত্রেরা আরব-দেশের ইউফ্রেটিস নদীর পূর্ব্ব তীরে ব্যাবিলনে এমন একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন যে মহা-জলপ্লাবন হইলেও যেন আর তাঁহারা বিপন্ন না হন, সেই স্তম্ভের উপর চড়িয়া তাঁহারা প্লাবনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। ভগবান তাঁহাদের তিন ভাইয়ের ভাষা পৃথক করিয়া দিয়া তাঁহাদের স্পর্দ্ধা পণ্ড করেন। তখন Shem রহিলেন আরবে; তাঁহার বংশধর Shemites বা Semitic Peoples—ইহুদী ও আরব। Ham (উষ্ণ বা কৃষ্ণ) গেলেন আফ্রিকায়। Japheth গেলেন গ্রীসে; তাঁহার পুত্র Javan হইতে যবন বা গ্রীক এবং আর্য্যজাতির উদ্ভব হয়। যে বাবিল্-চূড়াতে বহু ভাষার উৎপত্তির সূত্রপাত, বহুভাষাবিৎ আচার্য্য হরিনাথ দে যেন সেই বাবিল্-চূড়ার তুল্য ছিলেন।

দানেশ-মন্দী তাজ—জ্ঞানের মুকুট, জ্ঞানী শিরোমণি।

ছেলের দল—১২৪ পৃষ্ঠা

১২৪ পৃষ্ঠা—হিবাচীতে আগুন জ্বেলে—জাপানে যে পাত্রে জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া আগুন পোহানো হয়, তাহাকে হিবাচী বলে।

১২৫ পৃষ্ঠা—পদ্মকোষের বজ্রমণি—বজ্রাদ্ অপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদ্ অপি।

আলাদীনের মায়ার প্রদীপ—অঘটন-ঘটন-পটু।

শীতান্তে—১২৬ পৃষ্ঠা

১২৬ পৃষ্ঠা—দুনিয়ার দুই পিঠে ইত্যাদি—যেমন বাঁচার মধ্যে আনন্দ আছে, তেমনি সজাগ ভাবে মরার মতন মরাতেও আনন্দ কল্যাণ আছে,

কেবল জীবন্মৃত অবস্থা বা কর্ম্মহীন রোগাতুর হইয়া যে মৃত্যু তাহা নিন্দনীয়, উদ্ভিদের ন্যায় বা জড়ের ন্যায় জীবন যাপন হেয়।

ফুল-শিরণি—১২৭

ফুল-শিরণি—হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের প্রতীক; ফুল হিন্দুর পূজার উপকরণ, আর শিরণি বা মিষ্টান্ন মুসলমানের পীর-পূজার উপকরণ। ফুল ও শিরণি একত্র মিলিত হওয়া মানে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির মিলন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও আরব-পারস্যের সংস্কৃতির মিলন।

১২৭ পৃষ্ঠা—গুগ্‌গুলু……ধূপের ধূমে—গুগ্‌গুলু আর ধূপ ভারতীয়, লোবান ও গুলাব আরব-পারস্যের।

সত্যপীর—বোগ্‌দাদের মুসলমান সাধক মন্‌সুর হল্লাজ 'আন্‌-অল্‌-হক্' সোঽহং আমিই সত্যস্বরূপ এই বাণী প্রচার করিয়া গোঁড়া মুসলমানদের হস্তে নিহত হন ৯১৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি নিজেকে সত্য-স্বরূপ বলিয়া প্রচারিত করেন বলিয়া তিনি পরে সত্যপীর নামে পরিচিত হন। সম্রাট্ আক্‌বরের দীন-ই-ইলাহী বা সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলমানের দেবতার একত্ব অনেকে উপলব্ধি করেন, এবং তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের নাম সম্মিলিত করিয়া দেব-কল্পনা করা হয়। শ্রীকবিবল্লভের সত্যপীরের পাঁচালিতে সত্যপীর খোদারই অপর নাম বলা হইয়াছে—

খোদায় কহেন দুহে (সদাগরের দুই স্ত্রীকে)—শুন মোর বাণী।
সিতাবি করহ সত্যপীরের শিরণি॥
মক্কার রহিম আমি, অযোধ্যায় রাম।

এই সত্যপীর পরে হিন্দুর দেবতা সত্য-নারায়ণে পরিণত হন। স্কন্দ-পুরাণের রেবাখণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে সত্যনারায়ণের কাহিনী আছে। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে, মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনো সময়ে, এবং ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনা করেন।

—হিন্দুর মুসলমান দেবতা, ভারতবর্ষ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ।

সফেদ বাতাসা—সাদা বাতাসা, যাহা সত্যনারায়ণকে ভোগ বা শির্নি দেওয়া হয়।

১২৮ পৃষ্ঠা—নিখিল—সমস্ত, কোনো স্থান শূন্য না রাখিয়া।

উষ্ণীষ-বিনিময়—৪৪ পৃষ্ঠার 'ঝোড়ো হাওয়ায়' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

সুফি—আরবী সফ্ অর্থে পবিত্রতা, গ্রীক সোফিয়া অর্থে জ্ঞান, মিষ্টিক। যিনি পবিত্র জ্ঞানময় মিষ্টিক জীবন যাপন করেন তিনি সুফি। আরবী সুফ মানে কম্বল। যে সকল সন্ন্যাসী কম্বলবস্ত্র তাহারা সুফি। সুফিদের ঈশ্বরারাধনার সহিত বৈষ্ণব সাধনার অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই পরমেশ্বরকে সখা সখী দয়িত বা দয়িতা রূপে ভজনা করেন।

বাউলে ও দরবেশে—বাউল ও দরবেশ উভয়েই সত্যদেবের উপাসক বৈরাগী সম্প্রদায়। যাহাদের মধ্যে হিন্দু ভাব বেশি ও মুসলমানী ভাব কম তাহারা বাউল, আর যাহাদের মধ্যে হিন্দু ভাব অপেক্ষা মুসলমানী ভাব অধিক তাহারা দরবেশ নামে পরিচিত।—অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।

বাহারে মিলায়ে……কাফি—যে রাগিণীর ভারতীয় ঢঙের নাম বসন্ত, তাহারই পারসিক ঢঙের নাম বাহার—বাহার মানে বসন্ত। যে রাগিণীর ভারতীয় ঢঙের নাম সিন্ধু, তাহারই পারসিক ঢঙের নাম কাফি।

এক মা'র কোলে—একই বঙ্গদেশে অথবা ভারতে বাস করিয়া।

বীণার সঙ্গে সিতার—বীণা ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, সাহিত্য-শিল্পি-সঙ্গীতের প্রতিরূপ, এবং সিতার পারসিক সংস্কৃতির প্রতিরূপ।

ভোজ ও পুত্তলিকা—১২৯ পৃষ্ঠা

ভোজ ও পুত্তলিকা—উজ্জয়িনীর রাজা ভর্তৃহরি নিজের স্ত্রীর পরানুরক্তির পরিচয় পাইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা হন। বিক্রমাদিত্য উর্বশী ও রম্ভার নর্ত্তন-নিপুণতার তারতম্য বিচার করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা-খচিত একটি সিংহাসন পুরস্কার পান। বিক্রমাদিত্য

অপুত্রক জীবন ত্যাগ করিলে রাজধানী ধ্বংস হইয়া যায় এবং সেই সিংহাসন মাটি-চাপা পড়ে। যেখানে এক কালে রাজধানী ছিল তাহা ক্রমে শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। যে-স্থানে সেই সিংহাসন মাটি-চাপা ছিল সেই ক্ষেত্রের অধিকারী ছিল এক ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত মূর্খ স্থূলবুদ্ধি ও অনুদার-চিত্ত ছিল। কিন্তু সে যখনই সিংহাসনের উপরের মাটির ঢিপির উপরে গিয়া বসিত তখনই সে বিচক্ষণ-বুদ্ধি উদার হইত। ইহা দেখিয়া ভোজরাজ সেই স্থানের মাহাত্ম্য আবিষ্কার করিবার জন্য সেই স্থান খনন করান এবং সেই সিংহাসন উদ্ধার করিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া যান। তিনি নিজের প্রাসাদে উহা স্থাপন করিয়া উহাতে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলে বত্রিশটি পুত্তলিকা একে একে বত্রিশটি গল্প বলিয়া ভোজ অপেক্ষা বিক্রমাদিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। পুত্তলিকারা ছিল শাপগ্রস্ত দুর্গার সখী। তাহারা শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ভোজরাজ তখন নির্জীব কাষ্ঠাসনে আরোহণ করিলেন।—কালিদাসের দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা।

চিত্রকর এই বিষয়টি লইয়া চিত্র অঙ্কিত করেন। কিন্তু কবি সেই চিত্র মধ্যে নিজের দেশের পরাধীন অবস্থার আভাস পাইয়া এই কবিতা রচনা করেন। পরাধীন জাতির লোকেরা নির্জীব পুত্তলিকার মতন মাথা পাতিয়া সিংহাসন বহন করে, কেহ তাহাতে বসিল না বসিল তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার কোনো অধিকারই তাহাদের থাকে না। চাষা ব্রাহ্মণ বিক্রমাদিত্যের স্বদেশী বলিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসিতে দিতে দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই। কিন্তু ভোজরাজ বিদেশী বলিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসিতে দিতে আপত্তি তুলিয়াছিল। কবি নিজের স্বদেশ-বাসীদের ঐ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার সহিত তুলনা করিয়াছেন। একদিন এই বঙ্গদেশের মহারাজা দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণ হইলে দেশের চাষা কৈবর্তেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং বরেন্দ্রের কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের অধিনায়ক দিব্য বা দিব্বোক মহীপালকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তো দেশের লোকে সেই চাষাদের সিংহাসনে বসাইতে কোনো আপত্তি করে নাই। তবে এখন অপরের

বেলা এত আপত্তি হইতেছে কেন?—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, গৌড়রাজমালা দ্রষ্টব্য।

১৩১ পৃষ্ঠা—হাপু-গেলা—হাঁপ হইতে হাপু। নৈরাশ্য-জনিত হা-হুতাশ। তুলনীয়—

মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব হাপু,
আমি হাট-বাজার করিব।—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর

অতএব হাপু-গেলা মানে নৈরাশ্য-জনিত হা-হুতাশ দমন করা।

হবু-মহারাজ—ভবিষ্য মহারাজ, যিনি পরে মহারাজ হইবেন।

হাপুস-নয়নে—বাষ্প হইতে হাপুস। অশ্রুবাষ্পপূর্ণ নয়নে।

চামচিকা—দুর্লক্ষণ কুৎসিত জীব ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা করে।

পরীক্ষা—১৩২ পৃষ্ঠা

কবি বলিতেছেন যে জীবনের দুঃখ বিপদ অমঙ্গল নয়, তাহার দ্বারা নবজীবন লাভের সাহায্য হয়। নিজের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মে।

১৩৩ পৃষ্ঠা—শ্যামিকা—শ্যামবর্ণত্ব, মলিনতা, সোনার খাদ।

আকিঞ্চন—১৩৪ পৃষ্ঠা

১৩৪ পৃষ্ঠা—লক্ষ ঠাঁয়ে নোয়াই মাথা ইত্যাদি—কবি সত্যেন্দ্র সত্যসন্ধ ছিলেন। যাহা সত্য, যাহা বিশ্বজনীন সর্ব্বজনীন তাহাকেই তিনি মান্য করিতে চাহিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ভগবান্ এক অরূপ অপরূপ সুন্দর আনন্দময় এবং সকল মানব সমান অভেদ। তিনি আত্মপ্রত্যয় ও শাশ্বত সত্যকেই অবলম্বন করিতে চাহিতেন, সঙ্কীর্ণ মতের নানা শাস্ত্র অনুশাসন ইত্যাদিকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি তাই এই প্রার্থনা করিতেছেন যে যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা যেন লোক-ভয়ে সমাজ-ভয়ে অমান্য না করেন। তিনি যেন অচেতন ভাবে সমস্ত কিছুকেই মানিয়া চলার দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে অপমানিত না করেন। পূর্ব্বের কত প্রতিজ্ঞা পালন করা

হয় নাই, তাহাদের স্মৃতি এখনো মনে রহিয়াছে, কিন্তু এমনি অভ্যাসের ও গতানুগতিকতার দাসত্ব যে তাহাদের পালন করিবার সাহস আর হয় না।

১৩৬ পৃষ্ঠা—পাখী-জনম শাখী-জনম হ'তে—কবি বিবর্ত্তনবাদ ও অভি-ব্যক্তিবাদের কথা বলিতেছেন। তিনি যখন বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে গাছ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, পরে পশু-পক্ষী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তখন হইতে তো ভগবান তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ভাঙিয়া গড়িয়া আসিয়াছেন।

পদ্ম-ফুলে রাখ্‌লে প্রভু মণি—বৌদ্ধদের মন্ত্র ওঁ মণিপদ্মে হুং। মণি-পদ্ম অর্থাৎ লাল-পদ্ম অবলোকিতেশ্বরের স্বরূপ। অবলোকিতেশ্বর হইতেছেন অবলোকিত ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মদৃষ্টি ও আত্মপ্রত্যয়ের দেবতা প্রভু—The Lord of the Highest Insight. পদ্ম হইতেছে সৃষ্টির প্রতীক, আর মণি শক্তির প্রতীক। পদ্ম-ফুলে মণি মানে কোমলতার মধ্যে দৃঢ়তা, সৌন্দর্য্যবোধের ও আনন্দ-বোধের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা। বিধাতা কবিকে একদিকে রসিক স্রষ্টা করিয়াছেন আবার অপর দিকে বুদ্ধিমান্ করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ে সক্ষম করিয়াছেন। কবি প্রমুক্ত বুদ্ধির অধিকারী হইয়া নিজেকে ধন্য মানিতেছেন এবং তাহার জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

আমি—১৩৭ পৃষ্ঠা

১৩৭ পৃষ্ঠা—মুড়কি-লাড়ুর ধামী—মুড়কি-লাড়ুতে ভরা ছোট ধামা বা ঝুড়ি।

শানাই-বাঁশী—বাদ্যযন্ত্র ও তাহার সুমধুর সুর।

কানাই-বাঁশী—এক প্রকারের কলা।

লেহা—স্নেহ, ভালোবাসা।

১৩৮ পৃষ্ঠা—সকল শোভা সুখের মাঝে ইত্যাদি—তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাহিণী' কাব্যের 'চিরন্তন' বা 'চির-আমি' কবিতা।

ধামী—ফার্সী শব্দ, অর্থ কাঁস, লকেট, ধুকধুকি, ক্লিপ্।

টো হিসাব—বাহিরের ও ভিতরের। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'কবির বয়স কবিতা, ক্ষণিকা কাব্যে।

সাল্‌তামামী—বৎসর-শেষের হিসাব-নিকাশ।

আবার—১৩৮ পৃষ্ঠা

১৩৭ পৃষ্ঠার 'আমি' কবিতাটি ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষা—১৩৯ পৃষ্ঠা

১৩১ পৃষ্ঠা—চোখে যখন দেখ্‌তে না পাই ভালো—যখন অবলম্বনীয় পথ স্থির নির্ণয় করিতে সংশয় হয়। ইহার মধ্যে কবির নিজের জীবনের একটি দুঃখ-কথা ব্যক্ত হইয়াছে। কবির দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, ডাক্তারেরা তাঁহার অন্ধতার ভয় করিতেছিলেন। কবি ভগবানের নিকটে সেই দুর্দ্দিনের জন্য আশ্রয় ও আলোক প্রার্থনা করিতেছেন।

নফর কুণ্ডু—১৪০ পৃষ্ঠা

কলিকাতার ভবানীপুরে চক্রবেড়ে রোডে নফর কুণ্ডুর স্মৃতিস্তম্ভে তাঁহার কীর্ত্তিকথা এইরূপ উৎকীর্ণ আছে—"যিনি সম্মুখবর্ত্তী ম্যান্‌হোল হইতে দুইজন মুসলমান ড্রেন-কুলিকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যিনি ইটালি রামকৃষ্ণ-মিশনের একজন সভ্য ছিলেন, পরহিত-সাধন যাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল, সেই স্বর্গীয় নফরচন্দ্র কুণ্ডুর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এই কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার সদ্‌গুণের পক্ষপাতী ইউরোপীয় ও দেশীয় জনসমূহ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত হইল। জন্ম ১০ই চৈত্র ১২৮৭, (২২এ মার্চ্‌, ১৮৮১) সাল ; মৃত্যু ২৯এ বৈশাখ ১৩১৪ সাল (১২ই মে ১৯০৭)।"

আমরা—১৪০ পৃষ্ঠা

১৪০ পৃষ্ঠা—যুক্তবেণীর গঙ্গা—যে স্থানে তিনটি নদী—বিশেষতঃ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—সম্মিলিত হয় সেই স্থানকে ত্রিবেণী-সঙ্গম-ক্ষেত্র বলে। দুইটি

ত্রিবেণী—প্রথম প্রয়াগে (এলাহাবাদে), দ্বিতীয় হুগলির উত্তরে। প্রথম ত্রিবেণী যুক্তবেণী—সেখানে তিনটী নদী আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে—যমুনা ও সরস্বতী গঙ্গার দুটি উপনদী (tributary); দ্বিতীয় ত্রিবেণী মুক্তবেণী—এখানে গঙ্গা হইতে দুইটি শাখা নদী (branch) যমুনা ও সরস্বতী নির্গত হইয়া গিয়াছে। ত্রিবেণী মুক্তিদায়িনী তীর্থভূমি।

বাম হাতে যার কমলার ফুল ইত্যাদি—বঙ্গদেশের বাম অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে শ্রীহট্ট অঞ্চলে কমলালেবু উৎপন্ন হয় এবং ডাহিন দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে বিহার প্রদেশে মহুয়া উৎপন্ন হয়।

ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট,—বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত কাঞ্চনজঙ্ঘা তাহার শৃঙ্গকাঞ্চন-মুকুটের ন্যায় শোভমান।

১৪১ পৃষ্ঠা—বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইত্যাদি—বঙ্গদেশে বাঘ, সাপ ও কুম্ভীর প্রায় সর্ব্বত্র। বাঙ্গালীকে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়া বাস করিতে হয়।

আমাদের সেনা ইত্যাদি—রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘু দিগ্‌বিজয় করিতে করিতে যখন বঙ্গদেশে আসেন তখন বাঙালীরা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক চারি প্রকার সৈন্য লইয়া রঘুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রঘুবংশ ৪।৩৬।

বিজয়সিংহ—৯৬ পৃষ্ঠার 'সিংহল' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

এক হাতে মোরা ইত্যাদি—ত্রয়োদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজারা একদিকে আরাকানী মগ ও অপরদিকে পাঠান-মোগলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন।

চাঁদ-প্রতাপের ইত্যাদি—শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের পুত্র চাঁদরায় মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান; কিন্তু কেদার রায় মোগলদের বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করেন এবং ১৬০২ সালে আকবরের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া সন্দীপ অধিকার করেন।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান ইত্যাদি—সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি কপিল প্রথম বিদ্বান ও জ্ঞানের আধার বলিয়া বিখ্যাত। ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্ তম্ অগ্রে জ্ঞানৈর্ বিভর্ত্তি।—শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ ৫।২। কপিলের

ক্রোধে সগর রাজার সন্ততিগণ ভস্মীভূত হয়। ভগীরথ গঙ্গাকে আনিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। যে স্থানে সগরসন্ততিগণ উদ্ধার লাভ করেন সেই স্থান সাগর নামে খ্যাত হইয়াছে। অতএব গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম-ক্ষেত্রে কপিল মুনির আশ্রম ছিল। গঙ্গা-সাগর-দ্বীপে এখনও কপিল মুনির মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ অনুমান করিয়াছেন যে কপিল বাঙালী ছিলেন। কপিলের সাংখ্য-সূত্রগুলি হীরক-হারের ন্যায় অমূল্য।

বাঙালী অতীশ……বাঙালী দীপঙ্কর—৯১ পৃষ্ঠার 'দার্জ্জিলিঙের চিঠি' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য। অতীশেরই পদবী ছিল শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর। কবি এখানে দুই ব্যক্তি অনুমান করিয়া ভুল করিয়াছেন।

পক্ষধরের পক্ষশাতন করি' ইত্যাদি—ন্যায় দর্শনের প্রথম প্রবর্ত্তক গৌতম এবং তাঁহার পরবর্ত্তী উদয়নাচার্য্য ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় মৈথিল ছিলেন। এই গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার শিষ্য জয়দেব মিশ্র এক পক্ষের পাঠ একদিনে আয়ত্ত করিতেন এবং দুর্ব্বল পক্ষকেও অবলম্বন করিয়া তাহাকে জয়ী করিতেন বলিয়া তিনি পক্ষধর মিশ্র নামে বিখ্যাত হন। জয়দেব পক্ষধর মিশ্রের পিতা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহাদেব, মাতা সুমিত্রা, পিতৃব্য হরিমিশ্র। পক্ষধর জয়দেবই প্রসন্নরাঘব নাটক রচনা করেন। পক্ষধর মিশ্র মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহাধ্যায়ী ও মিথিলার রাজা ভৈরব সিংহের সভাসদ ছিলেন। অতএব পক্ষধর মিশ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। জয়দেব পক্ষধর মিশ্র প্রসন্নরাঘব নাটক রচনা করিয়া পীযূষবর্ষ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস গোস্বামী তাঁহার হিন্দি রামায়ণে প্রসন্নরাঘবের অনুকরণ করেন। পক্ষধর মিশ্র নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ন্যায়তত্ত্বচিন্তামণির টীকা প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত হন। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণভট্ট) পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন; এবং গুরুকে ন্যায়ের তর্কে পরাস্ত করেন। পক্ষধর মিশ্র ছাত্রের মেধা দেখিয়া রঘুনাথকে মিথিলা হইতে কোনো পুঁথি বাংলায় লইয়া আসিতে দেন নাই। কিন্তু রঘুনাথ ন্যায়ের সমস্ত পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া বঙ্গদেশে নবদ্বীপে নব্যন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি—বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব-নিবাসী কবি জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, এবং তাঁহার প্রণয়িনী ছিলেন পদ্মাবতী। জয়দেব নিজেকে 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' বলিয়াছেন। ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে গীতগোবিন্দ রচিত হয়; গীতগোবিন্দ অতি সুললিত শব্দে গ্রথিত। জয়দেব নিজের রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥

স্বর্ণ-পদ্ম-সদৃশ সংস্কৃত-সাহিত্যে তিনি লালিত্য ও সৌরভ যোজনা করিয়া দিয়াছেন।

বরভূধরের ভিত্তি—যবদ্বীপের বোরোবুদুর মন্দির হিন্দুদের দ্বারা ৭৭৮-৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। সংস্কৃত বিহার শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া বোরো এবং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ শব্দ বুদুর হইয়া থাকিবে। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান যবদ্বীপে গিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। সেখানকার দেবমন্দির এখনো চণ্ডী-মন্দুত (চণ্ডীমণ্ডপ) নামে অভিহিত হয়। বোরোবুদুর একটি বিশাল বিস্তৃত মন্দির; তাহাতে বহু হিন্দু দেবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। বাঙালীরাই দেবীমন্দিরকে চণ্ডীমণ্ডপ বলে এবং বোরোবুদুরের মূর্ত্তিশিল্পের সহিত বঙ্গের মূর্ত্তিশিল্পের সাদৃশ্য দেখিয়া কবি অনুমান করিয়াছেন যে বঙ্গদেশীয় স্থপতিদের কীর্ত্তি ঐ মন্দির। বোরোবুদুর শব্দকে কবি বরভূধর শব্দের অপভ্রংশ মনে করিয়াছিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন যে মন্দিরটি বৃহৎ পর্ব্বত-সদৃশ বলিয়া বরভূধর নাম হওয়া সম্ভব

শ্যাম-কাম্বোজে ওঙ্কারধাম—৯৭ পৃষ্ঠার 'ওঙ্কারধাম' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

ধেয়ানের ধনে......বিট্‌পাল আর ধীমান—বরেন্দ্রী (নালন্দী) ধীমানের পুত্র বীতপাল গৌড়ীয় শিল্পকে সুন্দর করেন এবং মূর্ত্তিগুলিকে বাস্তবতা হইতে ভাবের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিয়া দেন। (Taranath's History of Buddhism in India)। ইংলণ্ডের আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর Epstein তাঁহার নিজের অপ্রাকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে প্রণিধান-

যোগ্য।—It (his sculpture) is an idea worked out in stone; a conception of the mind, not a copy of something they and I have seen.

আমাদের পট……অজন্তায়—দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভদেশাধিপতি বাকাটক রাজবংশের ও বাতাপি-রাজ্যাধিকারী চালুক্য রাজবংশের আমলে খৃষ্টীয় ৩য় শতক হইতে ৭ম শতক পর্য্যন্ত সময়ে অজন্তার গুহাগাত্রে চিত্র অঙ্কিত হয়। তাহাতে বিজয়সিংহের সিংহলে অবতরণের ও চালুক্য-রাজ পুলকেশীর রাজ-সভায় পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর দূতের উপঢৌকন প্রদানের (৬২৫-৬২৬ খৃঃ) ছবি আছে। হুয়েন সাং ৬৪১ সালে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভায় আসিয়া অজন্তার চিত্র দর্শন করেন ও তাহার প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে বাংলার পট চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি ও ভঙ্গী এবং অজন্তার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি ও ভঙ্গী একই প্রকারের; বাংলার পটাঙ্কন-পদ্ধতি এখনো কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে জীবিত আছে, কিন্তু অজন্তা-পদ্ধতি ভারতের অন্যত্র কোথাও নাই; অতএব বাঙালী পটুয়ারাই অজন্তার চিত্র অঙ্কন করেন।

কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে ইত্যাদি—কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি কতকগুলি সুর বাংলার উদ্ভাবনা ও বাংলার নিজস্ব বিশেষত্ব।

১৪২ পৃষ্ঠা—মন্বন্তর—এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ যে মানুষ তো কোন্ ছার মানুষের মূল আদিপুরুষ মনু পর্য্যন্ত মরিয়া যান।

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি'—বাঙালী ভগবান্‌কে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সখা, প্রভু, দয়িত ও দয়িতা রূপে আরাধনা করে। দেবতাকে আত্মীয় জানিয়া আমরা আকাশে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া দেবতার প্রীতি উৎপাদন করি।

আকাশে প্রদীপ জ্বালি—আকাশ-প্রদীপ দিই। ১১৯ পৃষ্ঠায় 'চৌদ্দপ্রদীপের' টীকা দ্রষ্টব্য। যমদীপ দানের মন্ত্র—আকাশ-প্রদীপ দানের মন্ত্র—

উল্কা-হস্তা নরাঃ কুর্য়ুঃ পিতৄণাং মার্গ-দর্শনম্।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে।
যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে॥

মৃত্যুনা পাশ-দণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপ-দানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তাম্ ইতি ॥
দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে ॥

আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি—বাঙালী গৃহস্থের ছেলে গৌরাঙ্গ, নিমাই, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতিকে আমরা ভগবানের অবতার জ্ঞান করিয়াছি।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম ১৮৬২) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন ও বিবেকানন্দ স্বামী নাম ধারণ করেন। তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে Parliament of Religionsএ বক্তৃতা করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করেন (১৮৯৩)। প্যারিসের Congress of Religionsএ বক্তৃতা করেন (১৯০০)। আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো শহরে বেদান্ত সোসাইটী স্থাপন করেন (১৮৯৯)। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে উদ্বোধিত করিবার ব্রতধারী কর্ম্মবীর সন্ন্যাসী ছিলেন। ১৯০২ সালে মৃত্যু হয়।

বাঙালী সাধক……শবসাধনার বাড়া—বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু জড় ও উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন আছে প্রমাণ করিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধক শব-সাধনা করেন; কিন্তু শব তো এককালে প্রাণবান্ ছিল। কিন্তু যাহা চিরকালই প্রাণহীন জড় তাহারও প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার করা শবসাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিষম ধাতুর ইত্যাদি—রসায়নাচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পারদ ও নাইট্রাইট মিলাইয়া একটি মিশ্র পদার্থ Mercurons Nitrite সৃষ্টি করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাসায়নিকেরা যাহাদিগকে বি-সম অ-সঙ্গত মনে করিতেন তাহাদের তিনি একত্র সম্মিলিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার Life and Experience of a Bengali Chemist পুস্তকে লিখিয়াছেন—Mereury and nitrites were supposed as unstable bodies by the Chemists. Mercurous Nitrite with Ammon Chloride forms a very complex compound.

বাঙালীর কবি ইত্যাদি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল ইত্যাদি—উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্ব্বসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রভানু নামক একজন তেলীর ছেলে এবং শান্তশীল নামক এক কুম্ভকার একই নক্ষত্রে একই লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজার কনিষ্ঠ পুত্র হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া উজ্জয়িনীর রাজা হইয়াছিলেন। চন্দ্রভানু তেলীর ছেলে হইয়াও ভোগবতী নগরের রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু শান্তশীল কিছুই হয় নাই। তাই সে তপস্যা করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পরে সে চন্দ্রভানুকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিল, এবং চন্দ্রভানুর শবকে বেতাল নামক ভূত করিয়া এক শ্মশানে শিরীষ গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার পরে সে বিক্রমাদিত্যকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিবার সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিল। একদিন সেই অঘোরক সন্ন্যাসী রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল—মহারাজ, আমি গোদাবরী-তীরে এক শ্মশানে শব-সাধন করিব, আপনি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে সেই শ্মশানে গিয়া আমাকে সাধনায় সাহায্য করিলে আমি সিদ্ধি লাভ করিতে পারি। বিক্রমাদিত্য সাহসী বীর ছিলেন; তিনি যদিও জানিতে পারিলেন যে এই সন্ন্যাসী তাঁহাকে বধ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে, তথাপি তিনি সন্ন্যাসীর অনুরোধে স্বীকার করিলেন। সেই অন্ধকার রাত্রিতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তিনি শ্মশানে গেলে, সেই অঘোরক সন্ন্যাসী রাজাকে বলিল—শ্মশানের একদিকে একটা শিরীষ-গাছে একটা শব ঝুলিতেছে, উহা আমার কাছে লইয়া আসুন। রাজা ভূত-প্রেত-সমাকীর্ণ শ্মশান দিয়া নির্ভয়ে সেই গাছের কাছে গেলেন এবং দেখিলেন একটা শব মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলানো আছে। রাজা চিনিতে পারিলেন যে উহা রাজা চন্দ্রভানুর শব। রাজা গাছে উঠিয়া তরবারি দিয়া শবের বাঁধনের দড়ি কাটিয়া দিলেন। শব মাটিতে পড়িয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে খলখল করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। রাজা গাছ হইতে নামিয়া শবের কাছে আসিতে না আসিতে সেই শব আবার গাছে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ ঝুলিয়া রহিল। রাজাও

তৎক্ষণাৎ পুনরায় গাছে উঠিয়া শবের দড়ি কাটিলেন এবং তাহাকে এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। তখন শব রাজাকে বলিল—মহারাজ, আমি পথে যাইতে যাইতে তোমাকে কতকগুলি গল্প বলিব, এবং প্রত্যেক গল্পের শেষে তোমাকে এক-একটি প্রশ্ন করিব। তুমি যদি সেই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ গাছে ফিরিয়া যাইব, আর জানিয়াও যদি ঠিক উত্তর না দাও তাহা হইলে তুমি বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইবে। রাজা বেতালের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বেতাল রাজাকে এক-একটি গল্পের শেষে এক-একটি প্রশ্ন করে। রাজাও সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন, আর সেই শবও প্রত্যেক বার গাছে ফিরিয়া গিয়া ঝুলিয়া থাকে। এইরূপে পঁচিশ বার রাজা তাহাকে পাড়িয়া আনিলে সেই বেতাল রাজার অধ্যবসায় ও সঙ্কল্প-সাধনের দৃঢ়তা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—মহারাজ, আমি তোমার অধ্যবসায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। অঘোরক শান্তশীল তোমাকে বধ করিবার জন্য তোমাকে বলিবে 'তুমি সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করো।' এবং তুমি প্রণত হইলেই সে খড়্গ দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিবে এবং তপ্ত-তৈল-কটাহে ফেলিয়া তোমাকে তাল নামক ভূতে পরিণত করিয়া নিজের বশীভূত করিবে। তুমি তাহাকে বলিয়ো যে তুমি রাজার ছেলে, কেমন করিয়া প্রণাম করিতে হয় তাহা তুমি জানো না। সে তোমাকে যেমন দেখাইয়া দিবার জন্য প্রণত হইবে অমনি তুমি তাহাকে বধ করিবে ও সেই তপ্ত-তৈল-কটাহে ফেলিয়া দিবে। রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের পরামর্শে অঘোরককে বধ করিয়া তাহার ও চন্দ্রভানু রাজার শব দুইটি কটাহে ফেলিয়া দিলেন। অমনি তাল-বেতাল নামে দুই বিকটাকৃতি বীর ভূত রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—মহারাজ, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, যখন যাহা আদেশ করিবেন তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব। এইরূপে রাজা বিক্রমাদিত্য তাল-বেতাল-সিদ্ধ হইয়া নানা অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন।

—বেতাল-পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা।

বেতালের মুখে যে উভয়-সঙ্কট—Dilemma—প্রশ্ন ছিল, সেই উভয়-সঙ্কট এখন আমাদের সম্মুখেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা চিরকাল

পরাধীন হইয়া থাকিতে চাই, না স্বাধীনতা চাই? যদি স্বাধীনতা চাই বলি, তাহা হইলে অধীনতার কঠিন শৃঙ্খল কঠিনতর হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদি পরাধীনতা চাই বলি তাহা হইলে মিথ্যা বলার অপরাধে ও দুঃখে বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া ভাবনা ও ভয় ছাড়িয়া আমরা সত্যকেই আশ্রয় করিলাম, সত্যাগ্রহী হইয়া বাঁচিয়া গেলাম। এখন আমরা জগতের সমস্ত স্বাধীন-জাতির সমকক্ষ হইবার সঙ্কল্প মর্ম্মে ও কর্ম্মে গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া-মরা অবস্থা হইতে প্রাণ পাইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতেছি। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা এবং অহিংসার মন্ত্র সাধনার জন্য আমরা শ্মশান-সদৃশ প্রাণহীন উদ্যমহীন দেশে বট-অশ্বথ-বিল্ব-পলাশ-আমলকী-বৃক্ষ-বেষ্টিত তপস্যা-বেদী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, এবং এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া জগতের অসাম্য বিভেদ হিংসা দ্বেষ পরস্বাপহরণ দূর করিয়া এক মহামানবতার বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিব। স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট্ ব্রুস্ সাত বার বিফল চেষ্টাতেও না দমিয়া অবশেষে দেশ স্বাধীন করিতে পারিয়াছিলেন; আমরা রাজা বিক্রমাদিত্যের আদর্শে পঁচিশ বার বিফলতাতেও সঙ্কল্প সাধনে হতোদ্যম নিরুৎসাহ ও নিরস্ত হইব না। স্বাধীনতা-লাভের স্বপ্ন প্রথম এই বাঙালীই দেখিয়াছিল, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের বন্দে-মাতরম্ কাগজে ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা কাগজে এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির বক্তৃতায় এই আকাঙ্ক্ষা বাঙালীই ঘোষণা করিয়াছিল, এবং এই বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরোজী সমগ্র ভারতের মুখপাত্র হইয়া ঘোষণা করেন যে আমাদের স্বরাজ চাই।

১৪৩ পৃষ্ঠা—মণি অতুলন…সৃজনের শতদলে—সৃষ্টির মধ্যে ঐশ্বর্য্যের যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা লুক্কায়িত হইয়াছিল তাহাকে সম্ভব করিয়া তোলার শক্তি আমাদেরই হাতে রহিয়াছে।

অতীতে যাহার ইত্যাদি—ভারতের অতীত যদি গৌরবময় ছিল, তবে ভবিষ্যৎও সেইরূপ গৌরবময় হইবেই হইবে, কেবল আমাদের [illegible] ও সত্যাগ্রহের মন্ত্রে সমস্ত জগৎবাসীকে দীক্ষিত করিয়া হিংসা দ্বেষ পরস্ব-লোভ দূর করিতে হইবে। তাহা হইলেই দেবতা যে ভার আমাদের উপরে ন্যস্ত করিয়াছেন সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমরা দেব-ঋণ

হইতে মুক্ত হইব এবং নিজেদের মুক্তির সহিত সমস্ত জগৎকে মুক্তি দিতে পারিব।

ঋষি টলষ্টয়—১৪৩ পৃষ্ঠা

ঋষি টলষ্টয় রাশিয়া দেশে ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক, এবং কঠিন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন ভগবান এক এবং সমস্ত মানব-জাতি একই ভগবানের সন্তান, ভাই-ভাই, সকলে মর্য্যাদায় সমান, মানুষের অন্তরেই ভগবানের পুণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়াদেশে যখন ধনী-দরিদ্রে ও শাসক-শাসিতে মহা বৈষম্য ছিল তখন তিনি সাম্য-মৈত্রীর মহাবাণী ঘোষণা করেন এবং নিজের জমীদারী ঐশ্বর্য্য ও গৃহের আরাম পরিত্যাগ করিয়া দেশের দরিদ্র কৃষকদের কুটীরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া কৃষকদিগকে প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার ও তাহাদের পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে সাহায্য করিবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেন। এইরূপ গ্রাম পর্য্যটনের সময়ে তিনি পথে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং একটি রেল্ওয়ে ষ্টেসনে তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯১০ সালে।

কালোর আলো—১৪৪ পৃষ্ঠা

এই কবিতায় শ্বেতকায় জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিবাদ ও কৃষ্ণকায় জাতির যোগ্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

১৪৪ পৃষ্ঠা—কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন—ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে যে ভগবানের কৃষ্ণ-জ্যোতিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পূর্ণ হইয়া আছে—

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ অমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।

ইংরেজ কবি Milton বলিয়াছেন যে বিভু ভগবান্ "is encircled with the majesty of darkness." ইহার উল্লেখ করিয়া Edmund Burke বলিয়াছেন—"An idea not only poetical, but philosophically just."

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন, তাহা ততই অন্ধকার।…সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণ-পুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার।"—শ্রীকান্ত ১ম। ১০।

কোমল হীরার কমল ফোটে ইত্যাদি—নীল আকাশ-সমুদ্রে চন্দ্র-তারা কোমল-হীরকের কমলের মতন ফুটিয়া উঠে।

দৃপ্ত বলীর শীর্ষ 'পরে ইত্যাদি—দৈত্যরাজ বলির মাথায় কৃষ্ণকায় বামন-রূপী বিষ্ণুর পাদপদ্ম স্থাপিত হইয়াছিল।—বামনপুরাণ।

১৪৫ পৃষ্ঠা—রূপে তাহার ভুবন আলো—ভাগবতে ভগবান্‌কে ভুবনসুন্দর বলা হইয়াছে।

কাল-অশোক—সম্রাট্ অশোক কুৎসিত ছিলেন, কিন্তু সৎকর্ম্মের দ্বারা চণ্ডাশোক হন ধর্ম্মাশোক, প্রিয়দর্শী, দেবানাং প্রিয়ঃ। মগধে অপর একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কালাশোক ও কাকবর্ণ। কবি এই দুই ব্যক্তিকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

হাব্‌সী কালো লোক্‌মানেরে ইত্যাদি—আফ্রিকার আবিসিনিয়া দেশের বাসিন্দা হাব্‌সী। হাব্‌সী ক্রীতদাস লুক্‌মান্‌-উল্‌-হকিম্ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন ও ঈসপের ন্যায় গল্প রচনায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ছুতার বা দর্জী বা পশুর রাখালের কাজ করিতেন। কোরাণের মধ্যে স্বয়ং আল্লা বলিতেছেন—"পুরাকালে আমি লোকমানকে জ্ঞান দিয়াছিলাম।"—সুরা ৩১।১১—১৯।

রিষ্টিনাশা—বিপদ-বিনাশন, অমঙ্গল-নিবারণ।

মীনা—**Enamel.**

জ্যোতির্ম্মণ্ডল—১৪৬ পৃষ্ঠা

যে সকল মনীষী ধীমান্ ধী'র জ্যোতিতে বঙ্গদেশকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সমাবেশ কবি সৌরজগতের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

১৪৬ পৃষ্ঠা—রবি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুগ-যুগন্ধর রাজা—রাজা রামমোহন রায়—জন্ম ১৭৭৪; বিলাত-যাত্রা ১৮২৭; বিলাতে মৃত্যু ১৮৩৩।

আর্ষ-লোক—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫)।

অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী—কবির পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত। ১১৬ পৃষ্ঠার '১৪ই জ্যৈষ্ঠ' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মযোগী বিদ্যারসাগর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১১১ পৃষ্ঠার 'সাগর তর্পণ' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিম বঙ্গের বৃহস্পতি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)।

বামে মধু—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩)।

উল্কা, গ্রহ, তারা, ধূমকেতু—যে-সব অল্পশক্তি কর্ম্মী বা সাহিত্যিক অকস্মাৎ উদয় হইয়া শীঘ্রই হতজ্যোতি হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

যথার্থ সার্থকতা—১৪৮ পৃষ্ঠা

মানুষ অদূরদর্শী, তাই সে অনেক সময়ে মঙ্গল মনে করিয়া অমঙ্গলের কামনা করে: কিন্তু সর্ব্বদর্শী সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ মঙ্গলময়, তিনি মানুষের কামনা বিফল করিয়া তাহাকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করেন। তুলনীয়—'আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।'—ব্রহ্মসঙ্গীত। তাই উপনিষদের ঋষিদের প্রার্থনা—যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুবঃ। রুদ্র, যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

বন্দরে—১৪৮ পৃষ্ঠা

১৪৮ পৃষ্ঠা কান দিয়োনা ক্রন্দনে—আত্মীয়া স্ত্রীলোকদের কান্নাকাটি গ্রাহ্য করিয়ো না।

সাগর-পথে যাত্রা-নিষেধ—বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্র ২।২।২; মনু-সংহিতা ৩।১৫৮; বৃহন্নারদীয় পুরাণ ২২।১৩।

১৪৯ পৃষ্ঠা—বাণিজ্যে যে বসত করে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

সিন্ধুজলে জন্ম তার—অত্রির কন্যা লক্ষ্মী দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সমুদ্রের কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবাসুর কর্ত্তৃক সাগর-মন্থনের কালে তিনি উত্থিত হন।—বিষ্ণুপুরাণ ১।৯; রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড ৭ অধ্যায়।

আনব ঘরে পুনর্ব্বার—প্রাচীন ভারতে লোকে সমুদ্রযাত্রা করিয়া দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিত, দিগ্‌বিজয় করিত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ৭ম শতাব্দী হইতে সমুদ্রযাত্রা অপ্রচলিত হইয়া ভারতবাসী গৃহকোণবাসী হইয়া পড়ে। সেই ত্রুটি সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মীকে গৃহে আবাহন করিয়া আনিতে হইবে।

বিদ্যা মৃত-সঞ্জীবন—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র জানিতেন। সেই মন্ত্র সুরগুরু বৃহস্পতি জানিতেন না। সেই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যগুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। —মৎস্যপুরাণ ২৪৯।৫-৬; বামনপুরাণ ৬২ অধ্যায়; মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি।

শুক্র ঋষি—শুক্ল ঋষি—শ্বেতকায় সত্যদ্রষ্টা ইউরোপীয় ও আমেরিক আচার্য্যগণ।

দেবযানীরে ইত্যাদি—কচ যেমন শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে তুষ্ট করিয়া দেবযানীর সাহায্যে শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু দেবযানীর বহু প্রলোভনেও তিনি ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হন নাই, তেমনি করিয়া আমাদের দেশের ছাত্রদেরও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া বিদেশিনীদের সাহচর্য্য করিতে হইবে এবং বিদেশিনীর সৌন্দর্য্যমোহে স্বদেশকে ও স্বদেশিনীদের উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

জালের কাঁঠি ইত্যাদি—খেপ্‌লা ঘুরণ জালের তলায় লোহার গুটিকা গাঁথা থাকে; জাল ঘুরাইয়া ফেলিলে জাল ছড়াইয়া জলের উপর পড়ে কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোহার কাঁঠির ভারে জাল জলের তলায় গুটাইয়া আসে এবং জলের সম্পদ নিজের আয়ত্তাধীন করে। তেমনি আমাদের ব্যবসায়ী ও ছাত্রগণ নানা দিগ্‌দেশে ছড়াইয়া গিয়া অর্থ বিত্ত ও জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া স্বদেশকেই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে।

হিন্দু যখন...যবদ্বীপ—খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে যবদ্বীপ হিন্দু অধিকারে আসে

এবং উহার সংস্কৃত নাম তাহার সাক্ষী। সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজ্যও ঐ সময় হিন্দুর দ্বারা স্থাপিত হয়। ১০১২-৪২ সালে রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয়ের রাজা শৈলেন্দ্রের রাজ্যের কিয়দংশ জয় করেন।

ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ—পশ্চিম বঙ্গের শাস্ত্র-ব্যবসায়ী গোঁড়া পণ্ডিতদের প্রধান দুই কেন্দ্র।

অর্কফলা—অক্ষরের মাথায় রেফের ন্যায় শিখা।

বিজয়—বিজয়সিংহ। ৯৬ পৃষ্ঠার 'সিংহল' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

উড়ুপ—ভেলা।

মিশর পেরু রোম জাপানে—খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী হইতে গুপ্ত-রাজাদের আমল ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সহিত বহু দেশের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক ছিল। See—A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest Times.—Dr. Radha-Kumud Mookherjee ; Early History of India—V. Smith.

কাঁটা ঝাঁপ—১৫০ পৃষ্ঠা

শিবের গাজনের সন্ন্যাসীরা চড়কের সময়ে ভয়ঙ্কর সাহসের কর্ম্ম করে, তাহারা কাঁটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তীক্ষ্ণধার বঁটির সারির উপর ঝাঁপ দেয়, জলন্ত অঙ্গার লইয়া ফুলখেলা করে। কবি বলিতেছেন যে যাহারা শিব বা মঙ্গলের উপাসক তাহাদিগকে এইরূপ সাহস-কর্ম্মেই দীক্ষিত হইয়া সকল ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া কল্যাণকে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যিনি মঙ্গলময় শিব, তিনি ভোলানাথ, অনাসক্ত সন্ন্যাসী, কিছুই তিনি চিরন্তন করিয়া রাখেন না, কোনো শোক দুঃখও তিনি চিরস্থায়ী হইতে দেন না, তিনি সকল দুঃখ মোচন করেন।

শিব যেমন বিশ্ব-সংসারী হইয়াও অনাসক্ত সন্ন্যাসী, শিবের উপাসকদেরও তেমনি সংসারে থাকিয়া অনাসক্ত উদাসীন হইয়া মঙ্গলব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি শিব তিনি আবার রুদ্র, তাই তাঁহার সাধনা

কেবলমাত্র সুখের পথে নয়, কাঁটা ও আগুনের উপর দিয়া যাত্রা করিয়া সেই মঙ্গলকে লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই শিবময় ভগবানের বিভূতি রহিয়াছে, কাহারও পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয়। অতএব হতাশ না হইয়া শিব-সাধন করিতে হইবে।

গান—১৫১ পৃষ্ঠা

১৫১ পৃষ্ঠা—সোনার কাঠি—জাগরণের সাধন-যন্ত্র।

রূপার কাঠি—নিদ্রার সাধন-যন্ত্র।

পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল—বঙ্গদেশের পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে আরাকান দেশে লবঙ্গ-ফুল জন্মে। পাঁয়জোর পায়ের একপ্রকার অলঙ্কার।

১৫২ পৃষ্ঠা—নীল-পদ্ম-আঁখি—নীলপদ্ম অক্ষি-স্বরূপ যাহার।

নীলকণ্ঠ পাখী ইত্যাদি—বিজয়া-দশমী তিথিতে নীলকণ্ঠ পাখী দর্শন ও তাহাকে ব্যাধ-বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—ঐ তিথিতে নীলগ্রীব শুভ্রগ্রীব পক্ষী দর্শন ও মোচন সর্ব্বকামফলপ্রদ।—তিথিতত্ত্ব। আমার দেশ মুক্তি স্বাধীনতা ও বিজয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।

নিবেদিতা—১৫২ পৃষ্ঠা

নিবেদিতা—আমেরিকার Miss Margaret Nobles স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হন এবং ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda—সংক্ষেপে Sister Nivedita বা ভগিনী নিবেদিতা নাম গ্রহণ করেন ও ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের সেবায় ও কল্যাণে আত্ম-নিবেদন করেন।

১৫২ পৃষ্ঠা—জ্বেলেছিলে স্বর্ণদীপ অন্ধকারে—তিনি কলিকাতার বাগবাজার পাড়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া বয়স্কা স্ত্রীলোক ও বালিকাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার ব্রত ধারণ করেন। তিনি পদ্মিনী উপাখ্যান পড়াইতে পড়াইতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। বিদেশী ওস্তাদ চিত্রকরের উৎকৃষ্ট চিত্র অপেক্ষা

নিরক্ষর গ্রাম্যনারীর আল্‌পনা-চিত্রের সমাদর করিতেন। ছাত্রীদের বলিতেন —তোমরা সর্ব্বদা 'ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!' জপ করিবে। যে-সমস্ত ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত হইয়াছে তাহাও তাঁহার সম্মুখে উচ্চারণ করার জো ছিল না, লাইন না বলিয়া 'রেখা' বা 'পংক্তি' বলিতে হইত, এমনি তাঁহার ভারত-প্রীতি ছিল।

দেহ রাখি শৈল-মূলে—১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর (বাংলা ১৩১৮ সালের ২৬এ আশ্বিন) দার্জ্জিলিং পাহাড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী—হিমালয় শঙ্কর-তুল্য, ভগিনী নিবেদিতা মৃতা সতীর তুল্য। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

সমুদ্রোদ্ধার—১৫৫ পৃষ্ঠা

১৫৬ পৃষ্ঠা—ক্ষতির খাতায় পড়্‌বে না সব ইত্যাদি—যদি তোরা সমুদ্রে উল্‌তে অর্থাৎ নামিতে সাহস করিস তাহা হইলে তোদের সমস্তই ক্ষতিকর হইবে না।

জাহাজীরা যাদের মানে ইত্যাদি—সমুদ্রযাত্রী বণিকেরা যাহাদের দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া সমুদ্র-যাত্রা করে ও ক্ষতি গ্রাহ্য করে না, তাহারা জানে যে ক্ষতি হওয়া সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত লাভ থাকিয়াই যায়। হাজা-মজার অর্থাৎ ক্ষতির।

ওলোন্‌-ঝোলায় ঝুল্‌তে—অবলম্ব শব্দ হইতে ওলম্‌, ওলোন। ভারযুক্ত দোলককে ওলোন বলে, পেণ্ডুলাম। পেণ্ডুলাম যেমন ইতস্ততঃ আন্দোলিত হয়, তেমনি সমুদ্রের ঢেউয়ে দোল খাইতে হইবে।

লোণা জলে রেশম পশম ইত্যাদি—যে-সব জাহাজ ডুবি হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-সব ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পণ্য-সম্পদ রেশম-পশম লোণা-জলে ডুবিয়া থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না, ভরা-ডুবি পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। অতীত ক্ষতির জন্য বৃথা লোণা অশ্রু ত্যাগ না করিয়া ক্ষতির সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আর দেওয়া নয় পতিত্ জনে ইত্যাদি—যাহারা পতিত হইয়াছে তাহারা নিজেদের অক্ষমতা নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা মহাপাপ অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে আর সেই নৈষ্কর্ম্যপাপে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে উৎসাহে উদ্যমে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রার্থনা—১৫৭ পৃষ্ঠা

কবি আত্মপ্রত্যয়কেই সকল শাস্ত্র অপেক্ষা মান্য মনে করিতেছেন এবং নিজে যাহা বিশ্বাস করেন তাহাই কর্ম্মে অনুষ্ঠান করিবার সাহস প্রার্থনা করিতেছেন।

নমস্কার—১৫৭

১৫৭ পৃষ্ঠা—আলোকে বসতি যার—ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময়, প্রভাময়, আদিত্যবর্ণ।

অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া—'আমি আছি' এই বোধের দ্বারা যিনি ওঙ্কারকে অর্থাৎ অস্তিত্বকে প্রকাশ করেন।

১৫৮ পৃষ্ঠা—শ্রী-রূপে কমলা ইত্যাদি—ওঁ—হাঁ, yea, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই আবার পালনকর্ত্তা; সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী ও ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী তাঁহারই নিত্য সহচরী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-কলা বিদ্যা-সাহিত্য সবই তাঁহারই বিভূতি। তাঁহারই বরে জগতে মিথুনতার আনন্দ।

ভাবের গঙ্গা ইত্যাদি—যিনি ভগবান তাঁহা হইতেই সমস্ত ভাবধারা প্রবাহিত হইতেছে, তিনি সকল ভাবের উৎস। তিনি চির-নবীন, তিনি সনাতন পুরাতন হইয়াও নিত্য নব নব রূপে প্রকাশমান। তিনি অনাসক্ত; কত লোকে বিধাতাকে কত প্রকারে নিন্দা করে, কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুতে উদাসীন। সমস্ত বিশ্ব-সংসারই তাঁহার গৃহস্থালী, তিনি মহাগৃহস্থ, অথচ তিনি কিছুতেই আসক্ত নন, যেই সৃষ্টি করেন অমনি তাহার সঙ্গে ধ্বংস করিতেও প্রবৃত্ত হন।

সৃজন-ধারার সোনার কমল ইত্যাদি—তিনি দয়াময় কোমল-প্রাণ সৃষ্টি-পালন-কর্ত্তা, আবার তিনিই রুদ্র ভয়ানক ধ্বংসের দেবতা। তিনি নিরন্তর বর্ত্তমানকে অতীত এবং ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমান করিয়া চলিয়াছেন এবং অতীতের মধ্য হইতে অমৃত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অমৃত ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছেন।

দেব-দর্শন—১৫৯ পৃষ্ঠা

১৫৯ পৃষ্ঠা—অর্দ্ধ-উদয়—ভগবান্ বাক্য-মনের অগোচর, তাঁহাকে জানিয়াও জানা যায় না, তাই তাঁহার যে উপলব্ধি তাহাকে কবি অর্দ্ধ-উদয় বলিতেছেন।

দেখেছি তোমার সহস্র বাহু ইত্যাদ ভগবান্ বিশ্বব্যাপী, সেইজন্য বিভু ভগবান্‌কে বিশ্বতোমুখ, সর্ব্বতোমুখ বলা হইয়াছে অনেক স্থলে। তুলনীয় -

সহস্র-শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।—ঋগ্‌বেদ, পুরুষ-সূক্ত।

সর্ব্বতঃ পাণি-পাদং তৎ, সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরো-মুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি॥ - শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৬।

অনেক-বাহূদর-বক্ত্র-নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্ত-রূপম্।

- গীতা, ১১।১৬।

নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্র-মূর্ত্তয়ে সহস্র-পাদাক্ষি-শিরোরু-বাহবে।

- বৃহন্ নারদীয় পুরাণ, ৪ অধ্যায়।

একের মধ্যে দেখেছি অনেকে ইত্যাদি তুলনীয়

অগ্নির্ যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

—কঠোপনিষৎ ২।২।৯।

১৬০ পৃষ্ঠা—সংযত তুমি, সংহত তুমি—পরমেশ্বর নিজের নিয়মে নিজে আবদ্ধ, তিনি যম।

পরিশিষ্টাংশ—শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং চিত্রমন্দির
১৫৭বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।